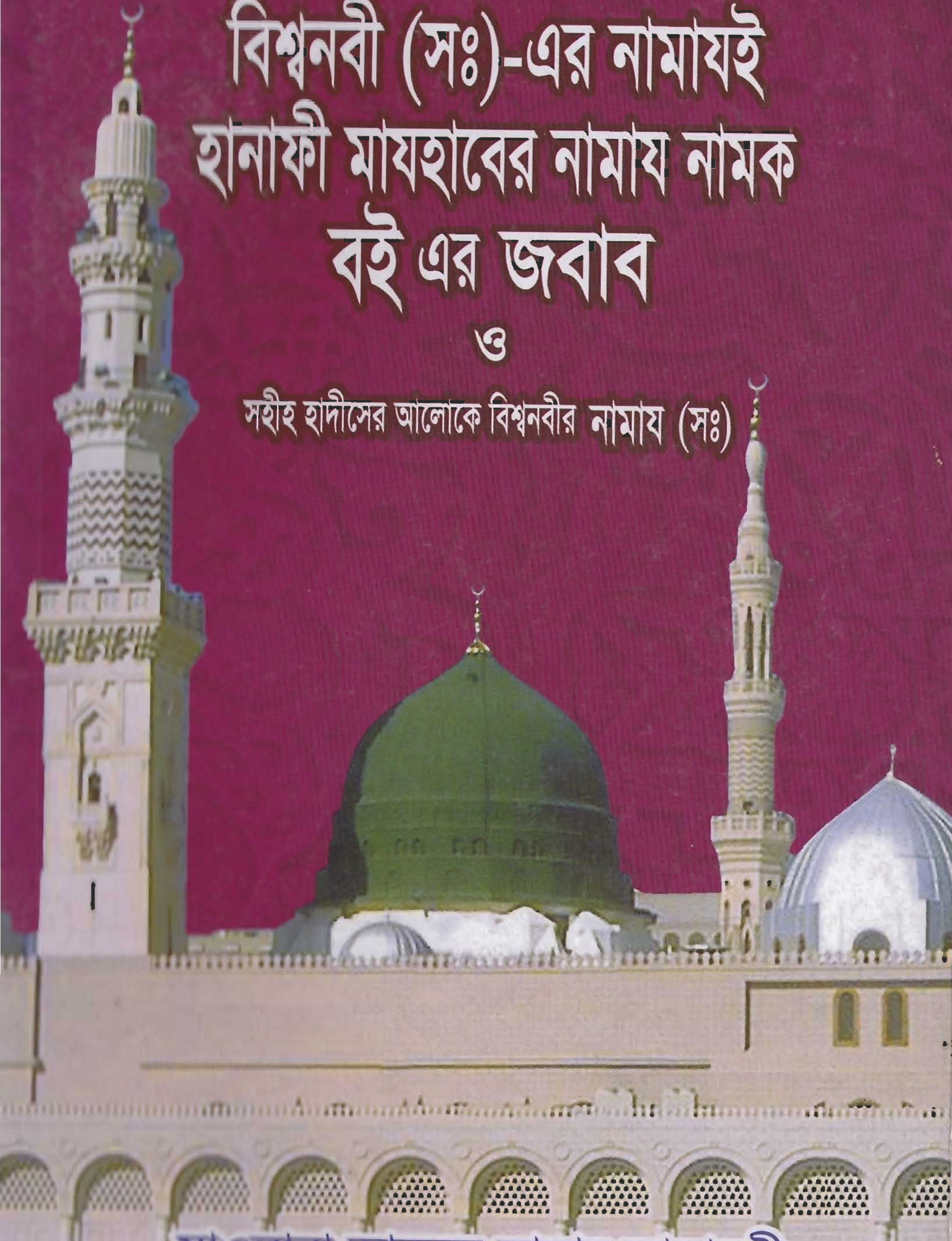
বিশ্বনবী (সঃ)-এর নামাযই হানাফী মাযহাবের নামায নামক বই এর জবাব

ও

সহীহ হাদীসের আলোকে বিশ্বনবীর নামায (সঃ)



মাওলানা আবদুস সাত্তার কালাবগী

বিশ্বনবী (সঃ) এর নামাযই
হানাফী মাযহাবের নামায নামক
বই-এর জবাব
ও
সহীহ হাদীসের আলোকে বিশ্বনবীর
নামায (সঃ)

লেখক ঃ

মাওলানা আব্দুস সাত্তার কালাবগী
গ্রাম+পোষ্ট ঃ কালাবগী,
থানা ঃ দাকোপ, জেলা ঃ খুলনা।
মোবাইল ঃ
০১৭২০-৪৭৯৮৭৬, ০১৯৩৮-০২৩২০৬

সম্পাদনায় ঃ

সৈয়দ মুজিবুর রহমান, (প্রাক্তন সম্পাদক)
মোবাইল ঃ ০১৯৩৪ ৯১৫৫৯১

প্রকাশকাল ঃ

২য় প্রকাশ, জানুয়ারী ২০১৩

অক্ষর বিন্যাশ ঃ

দেশ কম্পিউটার
৪৪/৩ শামসুর রহমান রোড,
খুলনা

মুদ্রণে ঃ

নিও কনসেপ্ট লিঃ চট্টগ্রাম।
ফোন ঃ ০৩১-৬১২১৪২

মূল্য ঃ ৭৫ (পঁচাত্তর টাকা)

প্রাপ্তিস্থান ঃ

লাকী ষ্টোর
২০, শঙ্খ মার্কেট খুলনা।
মোবাইল ঃ ০১৭১২-০৫১০০৫

আহলে হাদীস জামে মসজিদ
পাবলা, দৌলতপুর, খুলনা।
ফোন ঃ ০৪১৭৬২৪৪২, ০১১৯৯-৩৫৪০৪৮

তাওহীদ পাবলিকেশন্স
৯০, হাজী আব্দুল্লাহ সরকার লেন,
ফোন ঃ ৭১১২৭৬২, ০১১৯০-৩৬৮২৭২

হুসাইন আল মদানী প্রকাশনী
৩৮, হাজী আব্দুল্লাহ সরকার লেন, ঢাকা।
ফোন ঃ ০২৭১১৪২৩৮ ০২৯৫৬৩১৫৫,

আহলে হাদীস লাইব্রেরী
২১৪, বংশাল রোড, ঢাকা।
ফোন ঃ ০২৭১৬৫১৬৬, ০১৯১৫-৬০৪৫৯৮

আহলে হাদীস জামে মসজিদ
দক্ষিণ খুলশী জাকির হোসেন রোড, চট্টগ্রাম।
মোবাইল ঃ ০১৯১১-৭৯৩২৮০

শাহীন লাইব্রেরী
ফতেহ আলী মসজিদ (গেট সংলগ্ন) বগুড়া
মোবাইল ঃ ০১৭৪১-৩৪৫৫৯৮

আন-নূর ইসলামিক লাইব্রেরী-জি-১২
সুবাস্থ নজর ভেলি-শাহজাদপুর
গুলশান, ঢাকা-১২১২
মোবাইল ঃ ০১৮১৭-৫২৬৪২৩

ইসলামিয়া লাইব্রেরী
(আহলে হাদীস মসজিদ)
৬৫নং উত্তর চাষড়া
নারায়নগঞ্জ ।
মোবাইল ঃ ০১৯১৩-৯৫৮২৫৬

পাঠকের উদ্দেশ্যে

পাঠকগণ, আমাদের দেশের প্রচলিত মাযহাবী নামায আর সহীহ হাদীসের আলোকে বিশ্ব নবী (সঃ) এর নামাযের মধ্যে অনেক প্রভেদ। কথাটা কি খুব বিস্ময়কর বলে মনে হচ্ছে? না ভাই, কথাটি মোটেই বিস্ময়কর নয়। সঠিক ভাবে জেনে দেখুন, যেখানে ইসলামের মূল কেন্দ্র, যে স্থানে দাজ্জাল ঢোকারও অধিকার রাখে না, যেখানে ইসলামের সূচনালগ্ন থেকেই নামায পড়ার সুন্নাতি পদ্ধতি অপরিবর্তিত ও ধারাবাহিক ভাবে চলে আসছে সেই মক্কা এবং মদিনার নামাযের সঙ্গেও কিন্তু আমাদের সমাজে প্রচলিত মাযহাবী নামাযের মোটেই মিল নেই। এ ব্যাপারে যদি আপনি কিছু মুফতিদের কাছে জিজ্ঞেস করেন যে, মক্কা মদিনার নামাযের সঙ্গে আমাদের নামাযের মিল নেই কেন ? মক্কা মদিনায় নামাযে দাঁড়ানোর সময় একজন আর একজনের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ ও পায়ে পা মিলিয়ে কেন দাঁড়ান? মক্কা মদিনায় জায়নামাযে দাঁড়িয়ে প্রথমে ইন্নিওয়াজ্জাহাত.......... কেন পড়েন না? মক্কা মদিনায় নামাযে ইকামাতের বাক্যগুলি এক এক বার করে কেন বলা হয়? মক্কা মদিনায় হাত বুকের উপর বেঁধে নামায কেন পড়া হয়? মক্কা মদিনায় ইমামের পিছনে সূরা ফাতেহা কেন পড়া হয়? মক্কা মদিনায় সূরা ফাতেহা শেষে আমীন কেন জোরে বলা হয়? মক্কা মদিনায় রুকুতে যাওয়া এবং রুকু থেকে উঠার সময় রফাউল ইয়াদাইন কেন করা হয়? ইত্যাদি। দেখবেন কিছুটা অসত্যের আশ্রয় নিয়ে অমনি সঙ্গে সঙ্গে তারা বলে দেবে, আরে ওরা হচ্ছে শাফেয়ী মাযহাবের লোক। (আসলে কিন্তু এটা মোটেই সত্য নয়। ওরা কোরআন ও সহীহ হাদীসের একনিষ্ঠ অনুসারী রাসুল (সঃ) এর মৃত্যুর বহুকাল পরে আবিষ্কৃত কোনো মাযহাবের অনুসারী নয়)। অতঃপর সঙ্গে সঙ্গে আপনিও যদি বলে দেন, আমি শা'ফেয়ী বুঝি না মালেকী বুঝি না, মক্কা মদিনার নামাযের সঙ্গে আমাদের নামাযের মিল নেই কেন? তারা কি বেদাতী পন্থায় নামায পড়ে? তাদের নামাযের মধ্যে কোথায় কোথায় সহীহ হাদীসের ব্যত্যয় ঘটেছে? তখন দেখবেন, যে উত্তরটা আসবে তাতেই ওদের কৌশলটা ধরে নিতে পারবেন বলে আমি আশা রাখি।

পাঠকগণ, আমাদের দেশের প্রচলিত নামাযের পদ্ধতি যে সহীহ্ হাদীস ভিত্তিক নয়। আর সালাফী তথা মক্কা মদিনার নামাযের পদ্ধতি যে রাসুল (সঃ) এর সহীহ হাদীস ভিত্তিক, সে কথার সত্যতা হানাফী মাযহাবের বরেণ্য ফেকাহর কেতাবে কিন্তু তা স্বীকার করা হয়েছে। তা আপনারা অনেকেই হয়তো তা জানেন না।

কিন্তু পূর্বেকার যারা হানাফী মাযহাবের মুফতী মুহাদ্দিস ছিলেন তাদের মধ্যে আল্লাহ ভীতিটা প্রবল ছিল এ জন্যে তারা রাসূল (সঃ) এর সহীহ হাদীসের সম্মান করতেন যেটা সহীহ সেটাই প্রকাশ করতে দ্বিধা করতেন না এবং আমল ও করতেন কেউ প্রকাশ্যে আবার কেউ গোপনে। ১

*১ প্রকাশ্যে যেমনঃ- আল্লামা শামছুল হক ফরিদপুরী হানাফী (রহঃ) ইমামের পিছনে সুরা ফাতেহা আস্তে পড়তেন, যার কারণে এখতেলাফ করে মুহাদ্দিস আব্দুস সাত্তার কালীগঞ্জ গওহরডাঙ্গা মাদরাসা থেকে চলে গিয়ে ছিলেন। **আর গোপনে যেমন**- আমাদের খুলনা-সিটি আহলে হাদীস জামে মসজিদের খতিব মরহুম আলী আকবার বিয়াযী সাহেব একটা ঘটনা শুনিয়ে ছিলেন ঃ দেউবন্দ মাদরাসার একজন বড় মুহাদ্দীস রফ্উল ইয়াদাইনের হাদীস পড়ানোর সময় ছাত্রদেরকে বলছিলেন "আয় আল্লাহ ওয়ালু-তুম লোগ্ ভি রফউল ইয়া দাইন কর লিয়া করো? এ সহীহ হাদীস ছে ছাবেত হ্যায়"। অর্থাৎ - ওস্তাদ ছাত্রদেরকে বলছেন- হে আল্লাহ ওয়ালারা তোমরাও নামাযে রফউল ইয়াদাইন করো এটা সহীহ হাদীস থেকে প্রমাণিত। তখন ছাত্ররা বললেন হুজুর "আপ কিউ নেহি কারতে"? আপনি করেন না কেন? তখন ওস্তাদ বললেন-"মায় রাতমে কর লিয়া করতা হু"। আমি রাত্রে করি। তখন ছাত্ররা বললেন কেন হুজুর আপনি রাত্রে করেন কেন? উত্তরে তিনি বলছিলেন দেখ বাবা, এত বড় দেউবন্দ মাদ্রাসা এটা একটা হানাফী প্রতিষ্ঠান। এখানে যদি আমি প্রকাশ্যে দিনের বেলায় রফউল ইয়াদাইন করি তাহলে একটা হৈ চৈ পড়ে যাবে তাই সেটা এড়ানোর জন্য আমি রাত্রে করি।*

কিন্তু দুঃখের বিষয় একবিংশ শতাব্দীর কিছু মাযহাবী মুফতী সাহেবগণ তারা নিজেরাতো সহীহ হাদীসের উপর আমল করছেই না এবং কাউকে আমল করাতেও উদ্বুদ্ধ করছেন না। উপরন্ত সহীহ হাদীস যদি মাযাহাবী মাসলার বিপক্ষে হয় তা হলে ঐ সহীহ হাদীসটি মাযহাবী মাসলার পক্ষে আনার জন্য হাদীসের মানে ও শব্দের মধ্যে সুক্ষ্ম ভাবে বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে মাযাহাবী মাসলার পক্ষে ঘুরিয়ে দেন। আমার এই বইটা সম্পূর্ণ পড়লে তা আপনারা অনেকটা বুঝতে পারবেন বলে আমি আশা রাখি।

ان اريد الا الاصلاح ماستطعت وما توفقي الا بالله

عليه توكلت واليه انيب

(বইটার মধ্যে হয়ত কিছু বাংলা বানানের ভুল থেকে যেতে পারে। পরবর্তী সংস্করণে ঠিক করে দেওয়ার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।)

আব্দুস সাত্তার কালাবগি

দক্ষিণ বঙ্গের প্রখ্যাত আলেম ও বহু গ্রন্থ প্রণেতা আলহাজ মুফতী আব্দুর রহিম বাগেরহাটী সাহেবের

অভিমত ও দু'আ

হক্ক ও বাতিলের সংঘাত সৃষ্টির শুরু থেকেই। কিন্তু হক্কের মোকাবেলায় বাতিল কখনও জয়লাভ করেনি। সম্প্রতি মুফতী ওয়াক্কাস আলী নামে জনৈক মুফতী ভয়ানক আপত্তিকর শিরোনামে একটি বই লিখেছেন যে, "বিশ্বনাবী ﷺ এর নামাযই (একমাত্র) হানাফী মাযহাবের নামায"। বইটির ভিতরে দেখলাম বেশীরভাগ জাল, যঈফ তথা মওযু হাদীস ও বানোয়াট কথা দ্বারা প্রমাণ করার ব্যর্থ প্রচেষ্টা চালিয়েছেন যে, শাফেয়ী, মালেকী, হাম্বলী ও আহলে হাদীস- এদের কারোর নামাযই বিশ্বনবী ﷺ-এর নামায নয়, একমাত্র হানাফী মাযহাবের নামাযই বিশ্বনাবী ﷺ-এর নামায।

আলহামদুলিল্লাহ শ্রদ্ধেয় মাওলানা আব্দুস সাত্তার কালাবগী ভাই তার যথাযথ জবাব দিয়েছেন এবং সাথে সাথে বিশ্বনবী ﷺ-এর নামাযের সঠিক চিত্রটিও তুলে ধরেছেন। বইটি কিছুটা সংক্ষিপ্ত আকারে হলেও মাশা-আল্লাহ খুবই আর্কষণীয় ও সুন্দর হয়েছে।

দো'আ করি আল্লাহ তাঁর শ্রমকে কবূল করুন এবং সার্বক্ষাণিক বাতিলের মোকাবেলায় ও সত্যের পক্ষে এভাবে কলম ধরার তৌফিক দিন। আমীন॥



আব্দুর রহিম বাগেরহাটী

নামাযে রাসুল (সঃ) এর সুস্পষ্ট ঘোষণা-

بين الرجل وبين الشرك والكفرترك الصلاة

অর্থাৎ ঃ কোন মানুষ এবং শির্ক ও কুফরের মধ্যে পার্থক্য হলো নামায না পড়া। মুসলিম, (মেশকাত ৪৮ পৃঃ)।

সুতরাং একজন মুসলমান হতে হলে শত কষ্ট হলেও ধৈর্য্যের সঙ্গে নামায আকড়ে ধরতে হবে। এ ক্ষেত্রে অবহেলা করলে দুর্ভোগ অবধারিত। এ ব্যাপারে আল্লাহর বাণী الذينهم عن صلاتهم ساهون

দুর্ভোগ তাদের জন্য যারা তাদের নামায সম্পর্কে উদাসীন। (সুরা মাউন)।

চরম ভীতি প্রদ ভয়ংকর কেয়ামতের দিনে নামাযের মাধ্যমেই ব্যক্তির জান্নাত ও জাহান্নামের ঠিকানা নির্ধারিত হবে। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল বলেন, হাদীসে এসেছে প্রত্যেক নবী মৃত্যুর পুর্ব মুহূর্তে তার উম্মতকে যে অসিয়ত করেছেন তা হল নামায। অন্য হাদীসে এসেছে যে, রাসূল (সঃ)এর ও শেষ অসিয়ত ছিল উম্মতদের প্রতি এই নামায। এই মর্মে রাসুল (সঃ) বলেন– যে ব্যক্তি নামাযের হেফাযাত করবে না কেয়ামতের দিন তার জন্য উহা জ্যোতি দলিল ও মুক্তির উপায় হবে না। (আহ্মাদ দারেমী, মেশকাত ৫৯ পৃষ্ঠা)। উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় হাফেয ইবনুল কাইয়ুম বলেন, যে ব্যক্তি অর্থ সম্পদের মোহে বে-নামাযী হয়ে যায় তার হাশর হবে হযরত মুসা (আঃ) এর চাচাত ভাই বখীল ধনকুবের কারুনের সাথে। যে ব্যক্তি রাষ্ট্রীয় বা রাজনৈতিক ব্যস্ততার অযুহাতে বেনামাযী হয়ে যায় তার হাশর হবে মিশরের খোদাদ্রোহী শাসক ফেরাউনের সাথে। যে ব্যক্তি মন্ত্রী বা চাকরীগত কারণে বেনামাযী হয়, তার হাশর হবে ফেরাউনের মন্ত্রী হামানের সাথে। যে ব্যক্তি ব্যবসায়িক ব্যস্ততার কারণে বেনামাযী হয়ে যায়, তার হাশর হবে মক্কার ব্যবসায়ী নেতা উবায়বিন খালাফের সাথে। বলা বাহুল্য কেয়ামতের দিন কাফের নেতাদের সাথে হাশর হওয়ার অর্থ হল জাহান্নামবাসী হওয়া।

ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) বে-নামাযীদের কে তওবা করে নামাযী না হওয়া পর্যন্ত কোড়া মারতে এবং কয়েদ খানায় রাখতে আদেশ দিতেন। আর ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) বে-নামাযীকে তওবা করে আমল আক্বীদা ঠিক না করলে কতল করার হুকুম দিতেন। (মুসলিম শরাহ নব্বী ১মঃ ৬১ পৃষ্ঠা)।

বেনামাযীর জানাজা সম্পর্কে শাহ আব্দুল কাদের জিলানী (রহ) তার কেতাবে লিখেছেন.

পর বলে দিলেন صلو كما رايتموني اصلي নামায ওভাবেই পড়তে থাকবে যে ভাবে আম াকে পড়তে দেখেছ।
এই হাদীস থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় তারা ২০ দিন থাকার পর রাসুল (সঃ) তাদেরকে নছিহাত করলেন যে, আহালদের কাছে ফিরে যাও এবং তাদেরকে তালিম দাও। কিন্তু যখন নামাযের তালিম শিখানোর কথা আসল তখন বললেন- তোমরা আমাকে যে ভাবে নামায পড়তে দেখেছ ও ভাবেই পড়তে থাকবে।
পাঠকগণ, রাসুল (সঃ) যে-আহাল আওলাদদের কথা বলেছেন তারা কিন্তু শুধু পুরুষ নয় আহালদের মধ্যে কিন্তু মহিলারাও ছিলেন। যদি মহিলাদের নামায পুরুষের থেকে পদ্ধতিগত দিক দিয়ে পৃথক হত তাহলে অবশ্যই রাসুল (সঃ) বলতেন তোমরা আমাকে যেভাবে নামায পড়তে দেখেছ ওভাবে শুধু পুরুষদের, মহিলাদের কিন্তু ভিন্নভাবে। আর মালেক বিন হুয়ায়রেস (রাঃ) ও বলতেন যে, মহিল-ারা-তোমাদের নামায কিন্তু অন্য ভাবে। কিন্তু দেখা যায় মালেক বিন হুয়ায়রেস (রা) মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত মহিলাদের উদ্দেশ্যে তা কিছু বলেননি। আর বলবেন বা কেন? সম্মোধন তো রাসুল (সঃ) উভয়কেই করেছেন।
অতএব পদ্ধতিগত দিক দিয়ে যেমন ঃ রুকু, সেজদা, উঠা, বসা ইত্যাদি একই। কিন্তু পদ্ধতির বাহিরে পর্দার খাতিরে কিছু কিছু ক্ষেত্রে হাদীসে একটু পৃথক করা হয়েছে। যেমন ঃ মহিলারা পরিধেয় কাপড় দ্বারা পায়ের গিরা ঢেকে নিবে- (আবু দাউদ)। তাদের মাথা খোলা থাকবে না। (আবু দাউদ) ইমামের ভুল হলে পুরুষ সুবহানাল্লাহ বলবে, আর মহিলারা হাতে তালি দিবে উল্টোপিঠে। (ইবনে মাযা। মহিলারা পুরুষের ইমামতি করবে না।(ইবনে হযম)। মহিলা কাতারে একা দাড়াতে পারবে। (বুলুগুল মারাম)। কিন্তু পুরুষেরা কাতারে একা দাড়াতে পারবে না ইত্যাদি। এগুলি নামাযের পদ্ধতিগত দিক নয়। ইমাম ইবনে কুদামা লিখেছেন (الخ) --- والرجل والمرءة অর্থাৎ ঃ পুরুষ ও মহিলার নামায একই। ফল কথা পুরুষের জন্য যে সব আহকাম মহিলাদের জন্যও তাই। কারণ সম্বোধন উভয় কেই করা হয়েছে। (দেখুন আলমুগনী ১মঃ ৫৫ পৃষ্ঠা)। তাই দেখা যায় রাসুল (সঃ) থেকে সাহাবা-তাবেয়ী -তাবে তাবেয়ী যুগ হয়ে অদ্যাবধি ধারাবাহিক ভাবে মক্কা মদিনায় ও মহিলা পুরুষদের নামায পদ্ধতিগত দিক দিয়ে একই রয়েছে।

অতএব, আল্লাহর দরবারে গৃহীত নামাযের তরিকা বা পদ্ধতি হতে হবে রাসুল (সঃ) এর তরিকা বা পদ্ধতি অনুযায়ী। তা না হলে লক্ষ লক্ষ রাকাত নামায পড়েও কেয়ামতের দিন বে-নামাযী হয়ে উঠতে হবে। আর তার পরিনাম হবে অত্যন্ত ভয়াবহ। যারা বলেন রাসুল (সঃ) বিভিন্ন তরিকায় নামায পড়েছেন এটা রাসুল (সাঃ) এর উপর মিথ্যা অপবাদ। তিনি (সঃ) একই তরিকায় নামায পড়েছেন যেটা সহীহ হাদীস ভিত্তিক এক ও অভিন্ন। আল্লাহ আমাদের সবাইকে সহীহ্ হাদীস ভিত্তিক নামায পড়ার তৌওফীক দিন- আমীন।

পবিত্রতা হলো নামাযের পূর্ব শর্ত

ব্যক্তির ইবাদত কবুল হওয়ার জন্য প্রথম শর্ত হলো ব্যক্তিকে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনতে হবে। তাকে এ কথা মনে প্রাণে বিশ্বাস করতে হবে যে- لا اله الا الله লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু। আল্লাহ ছাড়া দ্বিতীয় কোন মাবুদ নেই। এবং এ কথার শাক্ষ্য মনে প্রাণে দিতে হবে- اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله

যতক্ষণ পর্যন্ত ঐ কাপড় তার শরীরের উপরে থাকবে ততক্ষণ তার কোন নামায কবুল হবে না। (তারগীব, মুসনদে আহমাদ)।

এসব আত্মিক পবিত্রতার সাথে সাথে বাহ্যিক পবিত্রতাও আবশ্যক। ব্যক্তির **দেহ শরীর** ও **পরিধেয় কাপড় চোপড়** পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে। যে সকল নাপাকী হতে **দেহ বা শারীরিক** পবিত্র অর্জন করতে হয় তা দুই প্রকার **(এক)** ছোট নাপাকী যার কারণে **অযু** ফরয হয়। **(দুই)** বড় নাপাকী যার কারণে **গোসল** ফরয হয়। আর অযুও গোসল উভয়ই অপারগতায় **তায়াম্মুম** করা ফরয হয়। এসব বিষয় সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা।

(এক) ছোট নাপাকী প্রস্রাব পায়খানা যার কারনে অযু ফরজ হয় তার নিয়মাবলি

রাসুল (সঃ) বলেছেন– যখন কেউ প্রসাব পায়খানায় যাবে তখন কেবলার দিকে মুখ ও পিঠ করবে না। (বোখারী মুসলিম মেশকাত ৪২ পৃষ্ঠা)। অতঃপর তিনি (সঃ) ইস্তেঞ্জার জন্য ৩টি পাথর নেওয়ার নির্দেশ দেন। তিনি (সঃ) গোবর, হাড় ও কয়লা দ্বারা কুলুখ নিতে নিষেধ করেছেন। (মেশকাত ৪২ পৃষ্ঠা)। শুধু পানি দিয়েও ইস্তেঞ্জা করা যায়। রাসুল (সঃ) যখন পায়খানায় যেতেন তখন পায়খানা করার পর পানি দিয়ে ইস্তেঞ্জা করতেন এবং অযু করতেন। তারপর বাম হাতটি মা-টিতে ঘষতেন।(আবু দাউদ; মেশকাত ৪৩ পৃষ্ঠা)। [৩]

৩ পায়খানা করে ঢেলা ব্যবহার করে তারপর আবার পানি দিয়ে ধোয়ার কথা হাদীসে পাওয়া যায় যদিও হাদীসটি দুর্বল। আর প্রেস্রার করার পর পানি থাকা সত্ত্বেও কূলূখ ব্যবহারের কথা কোন হাদীসে খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু প্রচলিত হানাফী মাযহাবে প্রসাব করার পর পুরুষাঙ্গ ধরে জোরে জোরে কাশি দেওয়া, ওঠা বসা করা, ৪০ কদম হাটা, পুরুষাঙ্গের মুখে কুলুখ নিয়ে পায়চারী করা– একদিক আমরা কয়েকজন লোক দেখি এক মুরুব্বি প্রস্রাব করে এ সব কর্মকান্ড করতে করতে হঠাৎ কাপড় উঁচু করে পুরুষঙ্গ দেখতেছেন। আমি তখন কাছে যেয়ে বললাম চাচা কি হয়েছে? যা করলেন তাতো দেখলাম এখন পুরুষঙ্গ দেখছেন কেন? (তিনি আমার ছোট দাদার চাচা শ্বশুর) তিনি উত্তর দিলেন বাবা প্রস্রাবের পর পুরুষঙ্গের ছিদ্র দেখা তার ভিতরে একটু পানি দেওয়া এটা সুন্নাত তা তুমি জান না? তারপর আমি খুঁজে দেখি ছুরাখ দেখা ও তার মধ্যে কিছু পানি দেওয়ার কথা হানাফী মাযহারের ফেকাহর কেতাবে রয়েছে। এসব কর্মকান্ডের সঙ্গে হাদীসের কোনই সম্পর্ক নেই বিধায় হানাফী মাযহারের এসব পদ্ধতি কখনও বিশ্ব নবী (সঃ) এর পদ্ধতি নয়। তা আবার অনেক হানাফী বিদ্বান স্বীকারও করেছেন। সুতরাং হানাফী মাযহারের প্রখ্যাত পন্ডিত আল্লামা আশরাফ আলী থানবী (রহঃ) লিখেছেন প্রস্রাবের পর কুলুখ নিয়ে বেহায়ার মত ঘোরাফেরা করবে না। (তালিমুদ্দিন ৫৯ পৃঃ)। এ ব্যাপারে ইমাম ইবন কাইয়ুম বলেন– প্রসাবের পর জোরে জোরে কাশী দেওয়া, ওঠা বসাকরা, পুরুষঙ্গের ছিদ্র দেখা এবং তার মধ্যে পানি দেওয়া এসব কাজ শয়তানী ওয়াস ওয়াসা ও বেদাত। এ কাজ যদি সুন্নাত হত তাহলে রাসুল (সঃ) ও সাহাবাগণ নিশ্চয় তা করতেন। (দেখুন ইগাসাতুল লোহফান ১ম ১৪৪ পৃষ্ঠা)। মক্কাও মদিনায় এবেদাত চালু নেই। আল্লাহ আমাদেরকে শরীয়তের মধ্যে মন গড়া আবিস্কৃত বেদাত থেকে রক্ষা করুন। আমীন।

দিয়ে ভালভাবে নাক ঝাড়া। (নাসাঈ, নাইলুল আওতার হাঃ নং-৪১১। ডান হাতে পানি নিয়ে দুইহাত মিলায়ে কপালের গোড়া হতে দুই কানের লতি হয়ে থুতুনির নিচ পর্যন্ত পুরা মুখ মন্ডল ধৌত করা।(বোখারী, মুসলিম মেশকাত হাঃ ৬৪৩)। প্রথমে ডান ও পরে বাম হাত কনুই সহ ধৌত করা। (বোখারী নাইলুল আওতার ১ম ২২৩ পৃঃ)। নতুন করে পানি নিয়ে (তিরমিযী) হাতের ভিজা আঙ্গুল গুলি মাথার সম্মুখ হতে পশ্চাতে ও পশ্চাত হতে সম্মুখে বুলিয়ে একবার মাসাহ করা। (বোখারী মুসলিম মেশকাত হাঃ নং-৩৯৪)। একই সঙ্গে হাতের ভিজা শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা কানের ভিতর অংশ ও বুড়ো আঙ্গুল দ্বারা কানের পিছনের অংশ মাসাহ করা। (আবু দাউদ তিরমিযী নাইলুল আওতার ১মঃ ২৪২ পৃষ্ঠা)। কান মাসাহ করার হাদীস সহীহ। (আল মুস্তাদ রাক)। আবু দাউদে আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) থেকে কান মাসাহ করার হাদীস সহীহ। ডান ও বাম পায়ের টাখনু সহ ভালভাবে রগড়িয়ে ধৌত করা। (বোখারী, মসুলিম, মেশকাত হাদীস নং ৩৯৪)। শেষে বাম হাতের ছোট আঙ্গুল দ্বারা পায়ের আঙ্গুল সমূহ খেলাল করা। (দারা কুতনী আবু দাউদ তিরমিযী মেশকাত হাঃ নং ৪৯৩)। হাতের কব্জি পর্যন্ত ধৌত করা, কুলি করা, নাকে পানি দেওয়া, মুখমন্ডল ধৌত করা, হাতের কনুই পর্যন্ত ধৌত করা, পা দুটি গিরা পর্যন্ত ধৌত করা- ৩ বার সুন্নাত। (বুখারী মুসলিম) রাসুল (সঃ) বলেছেন যখন কোন মু'মিন ব্যক্তি অযুর সময় তার মুখমন্ডল ধৌত করে তখন চক্ষুদ্বারা যত গোনাহ করে তা সবই পানির বিন্দুর সঙ্গে ঝরে যায়। যখন দুই হাত ধৌত করে তখন হাতের দ্বারা কৃত গোনাহ গুলি পানির বিন্দুর সঙ্গে ঝরে যায়। অতঃপর যখন দুই পা ধৌত করে তখন পায়ের দ্বারা কৃত গোনহ গুলি পানির বিন্দুর সঙ্গে ঝরে যায়। এভাবে অযু করার মাধ্যমে সে ব্যক্তি গোনাহ সমূহ হতে নিষকলুষ হয়ে যায়। (মুসলিম মেশকাত ৩৮ পৃষ্ঠা)।।

পূর্বেই অযু সহ পায়ে মোজা থাকলে (বোখারী, মুসলিম, মেশকাত হাং নং-২৭৩)। নতুন অযুর সময় মোজার উপরিভাগে দুই হাতের ভিজা আঙ্গুল গুলি পায়ের পাতা হতে টাখনু পর্যন্ত টেনে এনে একবার মসাহ করা।(মুসলিম, আবুদাউদ, মেশখাত হাঃ নং ৫১৮)। ভিজা আঙ্গুলগুলিমোজার উপর টানার নিয়মঃ

وضع رسول الله (ﷺ) يده اليمنى على خفه الايمن ويده اليسر على خفه الايسر ثم مسح هما مسحة واحدة

অর্থাৎ ঃ ডান হাত ডান পায়ের মোজার উপর ও বাম হাত বাম পায়ের মোজার উপর রেখে হাত দুটি মোজার ওপরিভাগ দিয়ে টেনে এনে একবার মাসাহ করা।

(দুই) বড় নাপাকী যার কারণে গোসল ফরয হয় তার নিয়মাবলি

ঐ গোসলকে ফরয গোসল বলে; যা করা অপরিহার্য্য এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন-

ان كنتم جنبا فطهروا

যদি তোমরা জুনুবী (নাপাক) হয়ে থাক তবে গোসল কর। (মায়েদা ৬নং আয়াত)।

যে কারণে গোসল ফরয হয়

(১) স্বামী-স্ত্রীর মিলন হলে (২) স্বপ্ন দোষে বীর্য্যপাত হলে। (৩) মেয়েদের হায়েয নেফাসের রক্ত বন্ধ হলে। এছাড়া মতান্তরে অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ কালে। (বোখারী, মুসলিম, মেশকাত ৪৭ পৃষ্ঠা)।

ফরয গোসলের নিয়ম

প্রথমে দু'হাত কব্জী পর্যন্ত ধুবে ও পরে বাম হাতে পানি নিয়ে লজ্জাস্থান ভালভাবে ধুয়ে নিবে। অতঃপর বিস্‌মিল্লাহ বলে নামাযের অযুর মত অযু করবে। অতঃপর প্রথমে মাথায় তিনবার পাক পানি ৫

৫ পানি থাকার জায়গা যেমন- কুয়া, পুকুর, হাউজ ইত্যাদির ভিতরে তবে কোন পানি পাক আর কোন পানি না পাক তা জানা মুশকিল। তাই রাসুল (সঃ) এ বিষয়ে একটি বিশেষ নমুনা বলে দিয়েছেন যে পানি কোন জিনিষ নাপাক করতে পারে না। তবে যে, জায়গায় দুই কুল্লা (৫ মশক) অর্থাৎ সোয়া ছয় মণ পানি থাকে।তাতে যদি নাপাক কিছু পতিত হয় তবে যতক্ষণ তার গন্ধ, স্বাদ অথবা রং পরিবর্তন না হবে ততক্ষণ সে পানি নাপাক হবে না। (আহমাদ, বুলুগুল মারাম-২ পৃষ্ঠা)।

ঢেলে চুলের গোড়ায় খিলাল করে ভালভাবে পানি পৌছাবে। তারপর সারাদেহে প্যানি ঢালতে হবে ও গোসল সম্পন্ন করতে হবে। তারপর গোসলের স্থান হতে একটু দুরে যেয়ে পা ধুয়ে নেবে। (আহমাদ, তিরমিযী নায়লুল আওতার)। গোসলের সময় মেয়েদের মাথার খোপা খোলার প্রয়োজন নেই। কেবল চুলের গোড়ায় তিন বার তিন অঞ্জলী পানি পৌছাতে হবে। (বোখারী মুসলিম, মেশকাত ৪৮ পৃষ্ঠা)। পুরুষের দাড়ি চুল ভালভাবে ভিজাতে হবে।(বোখারী মুসলিম মেশকাত)। মহিলাদের শুধু চুলের গোড়া ভিজলে যথেষ্ট হবে। (মুসলিম, মেশকাত ৪৮ পৃঃ)। পানি হল সকল পবিত্রতার মূল; অতএব, যাতে পবিত্র পানি দ্বারা অযু, গোসল এবং খাওয়া দাওয়া করা যায় তার প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখতে হবে। কেননা রাসুল (সঃ) বলেছেন- الطهور شطر الايمان। অর্থাৎ পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক অংশ। (মুসলিম, তিরমিযী)।

মেয়েলী রোগের বিবরণ ঃ

হায়েয– প্রাপ্ত বয়স্ক নারীদের প্রত্যেক মাসেই যে কয়দিন করে স্বাভাবিক ভাবে যে রক্ত স্রাব হয় তাকেই ঋতু, মাসিক বা হায়েয বলা হয়। ওটা সবার আবার সমান হয় না। কারুর তিন দিন, কারুর পাঁচ দিন, কারুর সাত দিন, কারুর দশ দিন পর্যন্ত চলতে থাকে। তবে অভ্যাস অনুযায়ী যে কদিন রক্ত প্রবাহিত হয় সে ক'দিন নামায, রোযা, কোরআন স্পর্শ, করবে না। তবে কোরআন তেলাওয়াত ও অন্যান্য দোয়া ও যেকের করতে পারবে- (এরওয়াউল গাল-লি) সহবাস ছাড়া স্বামীর সঙ্গে এক বিছানায় শোয়া ও অন্যান্য সাংসারিক কাজ চালিয়ে যেতে পারবে।

মাসিক শেষে রোযা কাযা করে নিবে; কিন্তু নামায কাযা করা লাগবে না। মাসিক অবস্থায় স্ত্রীর সঙ্গে হালাল জেনে সহবাস করলে কুফরী কাজ হবে। (তিরমিযী হাঃ নং-১৩৫)। তবে হারাম জেনে অধৈর্য্য হয়ে মিলিত হলে লাল রক্ত প্রবাহের সময় অর্থাৎ প্রথম দিকে এক দিনার ও হলুদ রক্ত প্রবাহের সময় অর্থাৎ শেষের দিকে হলে আধা দিনার কাফ্‌ফারা দিতে হবে। (তিরমিযী হাঃ নং ১৩৭, মেশকাত ৫৬ পৃঃ)। তবে এক্ষেত্রে খাটি তওবা করলেও চলবে। (দারেমী)।

নেফাস-সন্তান হওয়ার পর যে রক্ত ঝরে তাকে নেফাস বলে। সন্তান হওয়ার পর মেয়েদের রক্ত ঝরার মেয়াদ সর্বোচ্চ ৪০ দিন। তারপর রক্ত ঝরতে থাকলে গোসল করে নামায আদায় করতে হবে। মাসিক ও নেফাসের গোসল কালে পানিতে একটু লবণ দিয়ে নিতে হবে। (আবু দাউদ)।

ইস্তেহাযা–হাযেয ও নেফাসের নির্দিষ্ট সময় পার হওয়ার পরও যে রক্ত প্রবাহিত হয় তাকে ইস্তেহাযা বলে। ইস্তেহাযা বা প্রদর রোগের ক্ষেত্রে অন্যান্য মাসের নিয়মিত দিনগুলোর সংখ্যা বাদ দিয়ে গোসল করে পবিত্র হয়ে নামায রোযা ইত্যাদি ইবাদাত করবে। বয়সের প্রথম মাসিকের দিনগুলি ব্যতিক্রম দেখা দিলে মা, বোনদের নিয়মিত হিসাব তার জন্য প্রযোজ্য হবে। আর অতিরিক্ত দিন গুলোতে প্রত্যেক নামাযের জন্য গোসল করা ভাল নতুবা এক গোসলে দুই নামায একত্রে আদায় করবে।(আবু দাউদ তিরমিযী)। **অযু গোসল উভয়ই অপারগতায় তায়াম্মুম করতে হয়।**

তায়াম্মুমের বিবরণ

তায়াম্মুম অর্থ- সংকল্প করা। পারিভাষিক অর্থে পানি না পাওয়া গেলে অযু বা গোসলের পরিবর্তে পাক মাটি দ্বারা পবিত্রতা অর্জনের ইসলামী পদ্ধতিকে তায়াম্মুম বলে। আল্লাহ বলেন- যদি তোমরা পীড়িত হও কিংবা সফরে থাক

অথবা তোমরা পায়খানা থেকে আস কিংবা স্ত্রী স্পর্শ (সহবাস) করে থাক, অতঃপর পানি না পাও তাহলে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম কর, এবং তা দ্বারা তোমাদের মুখ মন্ডল ও হাত মাসাহ কর। (মায়েদা আয়াত ৬)। **নিয়ম ঃ** পবিত্র মাটির উপর দু'হাত মেরে তাতে ফু দিয়ে মুখমন্ডল ও হাতের কব্জি পর্যন্ত একবার বোলাতে হয়। (বোখারী, মুসলিম তিরমিযী ইবনে মাযা, মেশকাত হাঃ নং-৫৬০)। ৬

৬ আমাদের দেশে প্রচলিত হানাফী মাযহাবে তায়াম্মুমে হাতের ও মুখের জন্য দুইবার আলাদা আ-লাদা হাত মাটিতে মারতে হয় এবং হাতের কনুই পর্যন্ত মলতে হয়. এটার স্বপক্ষে কোন সহীহ দলিল নেই। এমন কি হানাফী মাযহাবের ফেকাহর কেতাবেও দুবার হাত মারার দলিল সঠিক নয় বলে লেখা হয়েছে। ফেকাহ আইনুল হেদায়া ও শরাহ বেকায়ার মধ্যে লেখা হয়েছে তায়াম্মুমে দুবার হাত মাটিতে মারার হাদীস যইফ এবং মরদুদ। (আইনুল হেদায়া ১মঃ ১৪২ পৃষ্ঠা, শরাহ বেকায়া ৫০ পৃষ্ঠা)। সহীহ হাদীসের অনুসারী মক্কা মদিনার লোকেরাও তায়াম্মুম করতে একবার হাত মাটিতে মেরে থাকেন। অতএব, যেটা সহীহ হাদীস ভিত্তিক নয় সেটা কস্মিনকালেও বিশ্ব নবী (সঃ) এর পদ্ধতি নয়। বিশ্ব নবী (সঃ) এর পদ্ধতি হতে হলে বিশ্বনবী (সঃ) এর সহীহ হাদীস ভিত্তিক হতে হয়।

যে কারণে তায়াম্মুম করতে হয়

* যদি পাক পানি পাওয়া না যায়। * পানি পর্যন্ত পৌছাতে গেলে যদি নামায কাযা হওয়ার আশঙ্কা হয়। * পানি ব্যবহারে যদি রোগবৃদ্ধির আশঙ্কা থাকে।* পানি পেতে যদি বিপদ বা জীবনের ঝুঁকি থাকে। উপরোক্ত কারণ সমূহের প্রেক্ষিতে অযুর পরিবর্তে অথবা উপরোক্ত কারণ সমূহ বিদ্যমান থাকলে ফরয গোসলের পরিবর্তে তায়াম্মুম করতে হয়। অজু ও গোসলের তাম্মুমের নিয়ম একই (সুরা মায়েদা ৬ নং আয়াত)। প্রয়োজনে তায়াম্মুম দীর্ঘদিন পর্যন্ত করা যায়। (বোখারী, মুসলিম)। তিরমিযী গ্রন্থে হাসান সনদে বর্নিত নিশ্চয় পবিত্র মাটি মুসল-মানদের জন্য অযু স্বরূপ যদিও ১০ বৎসর পর্যন্ত পানি না পাওয়া যায়।(তিরমিযী ১মঃ ৩২ পৃষ্ঠা)।

অযুর পরিবর্তে তায়াম্মুম করা হয় সুতরাং যে সব কারণে অযু নষ্ট হয় সে সব কারণে তায়াম্মুমও নষ্ট হয়। এছাড়া নামায পড়ার আগে পানি পাওয়া গেলে এবং তা ব্যবহারে সক্ষম হলে তামাম্মুম ভঙ্গ হয়ে যাবে।(ফেক্‌হুস সুন্নাহ ১মঃ ১০৫ পৃষ্ঠা)।

নামাযীর পরিধেয় কাপড় চোপড় পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে

আল্লাহ বলেন– তোমরা প্রত্যেক নামাযের সময় সুন্দর ও পবিত্র পোষাক পরিধান কর।(সুরা আ'রাফ ৩১ নং আয়াত ও সুরা মুদ্দাসিসর ৫নং আয়াত)। আয়াত দুটিতে বোঝা যায় পুরুষ মহিলা উভয়ই পবিত্র ও সুন্দর পোষাক পরিধান করে মহান আল্লাহর সামনে পাক পবিত্র জায়গায় নামাযের জন্য দাঁড়াতে হবে কোন নাজাছাত কাপড়ে লেগে থাকলে নামায হবে না। ৭

৭ প্রচলিত হানাফী মাযহাবের ফেকাহ তে লেখা হয়েছে; নাযাছাতে খফিফা। যেমন জানয়ারের প্রস্রাব বা মুরগীর পায়খানা ইত্যাদি যদি কাপড়ে লেগে যায় তাতে নামায হয়ে যাবে, তবে শর্ত হচ্ছে কাপড়ের ৪ ভাগের এক ভাগ হতে হবে এর বেশি হলে হবে না। (দেখুন হানাফী ফেকাহ কুদুরী)। কাপড়ে নাপাক লেগে থাকলে তাতে নামায হবে এটা যদি বিশ্বনবী (সঃ) এর পদ্ধতি হয় তাহলে ৪০ কদম হাটাহাটির কি প্রয়োজন?

নামাযীর পোষাকের বিবরণ ঃ মহিলাদের পা হতে মাথা পর্যন্ত সম্পূর্ণ সতর এবং পুরুষদের হাটু হতে নাভি পর্যন্ত সতর এবং তা ঢাকতে হবে। (মেশকাত ৭৩ পৃষ্ঠা)। ৮

৮ পুরুষের হাটু ও নাভি সতরের অন্তরভূক্ত কিনা? এবং সাধারণ কাজে কামে তা বের হলে অযু ভংগ বা গোনাহ হবে কিনা? প্রচলিত হানাফী মাযহাবে প্রচলন আছে হাটু সতর। ওটা নামায় ছাড়া ও সাধারণ ভারে বের হলে গোনাহ হয় এবং অযু নষ্ট হয় বলে জানে যা দলিল সম্মত নয়। যার কারণে আমাদের একজন ভাই কাজের সময় হাটুর উপরে কাপড় উঠেছিল তাই এলাকার কিছু মুফতীরা ধর্মীয় জলসায় ভৎর্সনা ও ব্যঙ্গ করে বলে ছিল যে, ওরা আহ্‌লে হাদীস নয় ওরা আহ্‌লে খবিশ-ইত্যাদি বহু কিছু। তাই আমি এ ব্যাপারে দলিল ভিত্তিক কিছু আলোচনা তুলে না ধরে পারছি না। পাঠকগণ, মানুষের মধ্যে দেখা যায় হাটু কাজে কামে অনেক সময় ঢেকে রাখা সম্ভব হয় না। অনেক সময় হাটুর উপরে কাপড় উঠে যায়। তাহলে ফরয বা সতর তরক করে অহরহ গোনাহের কাজ করছেন কিনা। দেখুন ভাই হাটু যে সতর এ সম্পর্কে হাদীসে কোন আলোচনাই পাওয়া যায় না। কিন্তু উরু সতর কি সতর নয় তা নিয়ে হাদীসে ব্যাপক আলোচনা হয়েছে। সতর সম্পর্কে আল্লাহ কোরআনে দুটি শরম গাহ এর কথা উল্লেখ করেছেন। তাই কেউ বলেন দুটি শরম গাহ এর সঙ্গে দুটি উরু ও ধরতে হবে। আর কেউ বলেন দুটি শরম গাহ এর সঙ্গে উরু ধরতে হবে না, উরু সতরের অন্তরভুক্ত নয়।

এ ব্যাপারে ইমাম বোখারী (রহঃ) একটি অনুচ্ছেদ এভাবে এনেছেন তার বোখারী শরীফের ৫৩ পৃষ্ঠায় باب مايذكر فى الخفذ- অর্থাৎ- উরুর ব্যাপারে যে সব বর্ণনা এসেছে। ইমাম বোখারী (রহ) বলেন- ইবনে আব্বাস যারহাদ, মুহাম্মাদ বিন যাহাশ নবী (সঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে উরু সতরের অন্তরভুক্ত। আর হযরত আনাস (রা) বলেন উরু সতরের অন্তভূক্ত নয়। কারণ রাসুল (সঃ) খায়বারের যুদ্ধে নিজের উরু খুলেছিলেন। ইমাম বোখারী (রহঃ) বলেন- আনাস (রাঃ) এর হাদীস (উরু সতর নয়) সনদের দিক দিয়ে বিশুদ্ধ আর ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর হাদীস (উরু সতর) সনদের দিক দিয়ে দুর্বল তবে সতর্কতা মূলক বলে মনে করা হয়। এভাবেই আমরা একে অপরের মধ্যে উরুর ব্যাপারে মতনৈক্য এড়ানোর জন্য তা ঢেকে নেই (যদিও উরু সতরের অন্তরভুক্ত নয়)। (বোখারী ১মঃ ৫৩ পৃষ্ঠা)।

আর ইমাম বোখারী তার গ্রন্থে হযরত আনাস (রাঃ) এর হাদীসটিই এনেছেন। ইমাম বোখারী (রহঃ) আরও বলেছেন- রাসুল (সঃ) নিজের উরু বের করে ছিলেন আবার তা ঢেকে ছিলেন। জায়েদ বিন সাবেত বলেন– একদা ওয়াহীর সময় রাসূল (সঃ) এর উরু আমার উরুর উপরে ছিল। উরু সতর এ ব্যাপারে কোন সহীহ হাদীস না থাকায় ইমাম বোখারী (রহঃ) তা সমর্থন করেননি। তবে তিনি সতর্কতা মূলক ভাবে ঢাকার কথাও বলেছেন। (দেখুন বোখারী ১ম ৫৩ পৃঃ)। মুফতী সাহেব! উরু সতর কি না তা নিয়ে দেখুন এখতেলাফ রয়েছে। যারা সতর বলছেন তাদের বর্ণিত হাদীস সহীহ নয়। আর যারা বলেছেন উরু সতর নয় তাদের বর্ণিত হাদীস দেখুন সহীহ। (বোখারী)। আর হাটুতো অনেক দুরের কথা তা সাধারণ ভাবে বের হলে গাত্রদাহ হবে কেন?

এবার এ ব্যাপারে হানাফী মাজহাবের আলেমদের মতামত দেখা যাক। হানাফী মাযহারের প্রখ্যাত পন্ডিত আল্লামা শাওকানী (রহঃ) বলেন, উরু শরম গাহের মধ্যে গণ্য এটা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

(হাটু ও নাভি নয়) তার বক্তব্য হচ্ছে এ মত বহু উলামার। ইমাম নব্বী ও (উরু সতর) এটার পক্ষপাতি। কিন্তু ইমাম মালেক ও ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ) এর বর্ণনার মধ্যে শুধু সামনে ও পিছনের রাস্তা অর্থাৎ শুধু দুটি শরমগাহ্ হচ্ছে সতর উরু সতর নয়। আপনি তো প্রচার করে বেড়ান যে চার মাযহার হক্কের উপরে আছে তাই ইমাম মালেক ও ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল চার মাযহাবের অন্তরভুক্ত কিনা তাও একটু ভেবে দেখবেন। (উরু সতর নয় একথা কিন্তু আমরা কখনো প্রচার ও করি না।) আর আহ্লে জাহের ও ইমাম ইবনে যারীর ও অন্যান্যদের মতও এটাই যে উরু সতর নয়। শেষে তিনি লিখেছেন হক্ক কথা হচ্ছে উরু টা যে শরম গাহের মধ্যে গণ্য তা কয়েকটি বর্ণনা থেকে বোঝা যায়। (দেখুন নাইলল আওতার)।

<u>এবার আসুন হানাফী মাযহারের আর একজন অন্যতম মুহাদ্দিস ভারত গুরু শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী (রহঃ)</u> তিনি লিখেছেন নামাযীর জন্য পোষাকের দুটি হদ রয়েছে। প্রথম হদ যেটা নামায সহীহ হওয়ার জন্য শর্ত বা জরুরী। সেটা হল পায়খানা ও প্রসাবের রাস্তা ঢাকা এবং দুটো উরু ও তার মধ্যে সামীল।

(হাটু ও নাভি নয়) কেননা পুরুষের উরু খাহেশাতের স্থান তাই উরুটা সতরের অন্তরভূক্ত এবং তা ঢাকতে হবে। আর মহিলাদের সমস্ত শরীর খাহেশাতের স্থান তাঁই তাদের সমস্ত শরীর সতর এবং তা ঢাকতে হবে। শাহ ওয়ালী উল্লাহ এটাই বুঝাতে চেয়েছেন, যদি কেউ হাঁটুর ওপরে কাপড় রেখে অর্থাৎ উরু ঢেকে নামাযে দন্ডায়মান হয় তাহলে প্রথম হদ যেটা শর্ত বা জরুরী তার আওতায় পড়ে। তাই তার নামায সহীহ হয়ে যাবে। তিনি হুজাতুল্লাহিল বালেগার মধ্যে এভাবে একটি অনুচ্ছেদ এনেছেন যে <u>"নামায সহীহ হওয়ার জন্য নামাযীর কতটুকু পোষাকের প্রয়োজন"</u>। সেখানে দেখুন বিস্তারিত। তাহলে নামায সহীহ হওয়ার জন্য হাটুর উপরে কাপড় যদি আপনাদের পন্ডিতদের মতে জায়েজ হয় তাহলে সাধারণ কাজ কর্মের জন্য কাপড় হাটুর একটু উপরে উঠলে আহ্লে খবিশ বলার কি আছে।

পাঠকগণ এ পর্যন্ত আলোচনায় যা বোঝা গেল উরু সতরের অন্তর্ভূক্ত কিন্তু হাটু সতরের অন্তর্ভূক্ত নয়। ওটা কাজে কামে বের হলে আহ্লে খবিশ হবেনা ও ব্যক্তি আহ্লে হাদীসই থাকবে। দারা কুতনীর একটি বর্ণনায় এসেছে সতর হচ্ছে হাটু পর্যন্ত। হাটু সতর তা কিন্তু বলা হয়নি। তবে হাদীসটির নিচে আবার লেখা রয়েছে اسناده ضعيف। হাদীসটির সনদ যঈফ। (দেখুন দারাকুতনী)

পাক পবিত্র জুতা পরে ও নামায পড়া যায়। (বুখারী, মুসলিম)। সাধারণ পাক পবিত্র বিছানায় নামায আদায় নিষেধ নেই। (বোখারী ১মঃ ৫৫ পৃষ্ঠা)। নামাযে টুপি পাগড়ী পরা বাধ্যতা মূলক নয়। টুপি ছাড়া ও নামায হয়। তবে পরা উত্তম। সাহাবীগণ নামাযে মাথা ঢেকে রাখতেন বলে প্রমান পাওয়াও যায়। (তামাম্মুল মিন্নাহ ১৬৪ পৃষ্ঠা) রাসুল (সঃ) বলেছেন তোমরা যা পরিধান করে আল্লাহর সাথে মসজিদে সাক্ষাত কর তার মধ্যে সর্বোত্তম রং হল সাদা। (ইবনে মাযা, মেশকাত ৭৩ পৃষ্ঠা)। কোন কাপড় না থাকলে উলঙ্গ অবস্থায় বসে বসে নামায আদায় করবে।(মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক ২য় ৫৮৪ পৃষ্ঠা)।

নামাযের সময়

দুনিয়ায় প্রত্যেক কাজ সময় মত করতে হয়। নইলে সফলতা লাভ করা যায় না। নামায হল সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদাত; অতএব কোরআন এবং হাদীসে যে সময়ের কথা উল্লেখ আছে সেই সময় তা আদায় না করলে তার কোন পারিশ্রমিক

পাওয়া যাবে না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন–

ان الصلاة كانت على المؤمنين كتاب الموقوتا

নিশ্চয়ই নামায নির্ধারিত সময়ে মুমিনদের উপর অবশ্য কর্তব্য বলে লিখে দেওয়া হয়েছে। (সূরা নেছা-১০৩ আয়াত)।

রাসুল (সঃ) বলেছেন– জিবরাইল (আঃ) কা'বা ঘরের কাছে এসে আমাকে নিয়ে দু-দু বার ৫ ওয়াক্ত নামাযের ইমামতি করে নামাযের সময় ও পদ্ধতি নির্ধারণ করে দিয়েছেন। (আবু দাউদ, মেশকাত ৫৯ পৃঃ)। রসূল(সঃ) কে জিজ্ঞাসা করা হল যে কোন আমলটি সবচেয়ে উত্তম, তিনি বললেন,

الصلاة لاول وقتها। প্রথম ওয়াক্তে নামায আদায় কর। (আবু দাউদ ১ম খন্ড ৬১ পৃঃ)

ফজরের সময় ঃ সুবেহ সাদেক হতে সূর্য উদয়ের পূর্ব পর্যন্ত। রাসুল (সঃ) ফজরের নামায খুব গালাসে (অন্ধকারে) সর্বদায় পড়তেন। (আবু দাউদ, নাইলুল আওতার ২য় ঃ ৭৫ পৃষ্ঠা)। হযরত আয়শা (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসুল (সঃ) ফজরের নামায এমন গালাসে পড়তেন যে, নামায শেষে মুসল্লিরা একে অপরকে চিনতে পারতেন না। (বোখারী, মুসলিম, মেশকাত ৬০ পৃষ্ঠা)। হানাফী মাযহারের ফেকাহর কেতাবে ও লেখা হয়েছে অন্ধকারে ফজরের নামায পড়া সহীহ হাদীসে প্রমাণিত।(দেখুন আইনুল হেদায়া ১মঃ ২৭১ পৃষ্ঠা)। ৯

*৯ প্রচলিত হানাফী মাযহাবের অধিকাংশ মসজিদে ফজরের নামায সহীহ হাদীস অনুযায়ী অন্ধকারে শুরু না করে এখনও ১৫ মিনিট ১০ মিনিট ৫ মিনিট বাকি আছে বলতে বলতে একে বারে ফর্সা করে ফজরের নামায শুরু করেন। এটা স্বয়ং ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মুহাম্মাদ ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এর সিদ্ধান্তের বিপরিত কাজ। (দেখুন ত্বাহাবী ১মঃ ৯০ পৃষ্ঠা)। আমাদের এলাকায় কিছু মুফতীদের চোখের সামনে ফজরের সময় দুটি বেদাত ইদানিং চালু হয়েছে। একটি হচ্ছে ১০ মিনিট ৫ মিনিট বলে মানুষদেরকে ডাকা ডাকি করা। যেখানে রাসুল (সাঃ) সাহাবীদের কে নিয়ে অনেক আলাপ-আলোচনা করার পর ওয়াহীর মাধ্যমে স্থির সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে, নামাযের জন্য ডাকা, ঘন্টা ধ্বনি নয়, আগুন জ্বালানো নয়, শিঙ্গা ধ্বনি নয় বরং আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকরা শব্দের ধ্বনি দ্বারা আযান হতে হবে। (আবু দাউদ)। **দ্বিতীয়**–বেদাতটি হচ্ছে ঘুম থেকে জাগার পর একটি দোয়া পড়ার কথা হাদীসে এসেছে, সেটা এখন ঘুম থেকে নয়- ফজরের আযানের শুরুতে ফিট করা হয়েছে। তবে যে কোন কাজে বা নিয়মে বিশ্বনবী (সঃ) এর দোহাই দিতে হলে সে কাজ বা সে নিয়মের তরিকা বা পদ্ধতি হতে হবে বিশ্বনবী (সঃ) এর বিশুদ্ধ তরিকা বা পদ্ধতি অনুযায়ী।*

যোহরের সময় ঃ সূর্য্য মাথার উপর থেকে হেলে যাওয়ার পর থেকে যতক্ষণ পর্যন্ত কোন লাঠি বা মানুষের ছায়া তার সমান দীর্ঘ না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত যোহরের ওয়াক্ত থাকে (মুসলিম, আবু দাউদ ইবনে মাযা, মেশকাত হাঃ ৫৮১। এ ব্যাপারে হানাফী মাযহাবের ফেকাহের সাক্ষ্য যোহরের নামাযের ওয়াক্ত এক মিছিল ছায়া হওয়া পর্যন্ত থাকে।(হেদায়া, দুররে মুখআর ১ম, ৬৪ পৃষ্ঠা)।

আসরের সময় ঃ বস্তুর মূল ছায়ার একগুণ হওয়ার পর থেকে আসরের ওয়াক্ত শুরু হয়। এবং হলুদ রং হওয়া পর্যন্ত বাকি থাকে। (মুসলিম)। তবে মুসলিম শরীফের মধ্যে এসেছে সূর্য্য হলুদ হলে তা শয়তানের দুই শিংয়ের মাঝখানে আসে, এ সময় নামায পড়ে মুনাফেকরা। (মুসলিম, মেশকাত হাঃ নং ৫৩৪)।
আসরের নামায এক মিছিল ছায়া হলে শুরু হয় এটা ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মুহাম্মাদ ও ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) থেকেও বর্ণিত আছে। হানাফী মাযহারের অন্যতম মুহাদ্দিস ইমাম ত্বাহাবী বলেন আমরা এটাকেই গ্রহণ করি। (দেখুন ত্বহাবী ৭৫ পৃষ্ঠা)। এ ব্যাপারে আল্লামা আব্দুল হাই লাখনবী (রহঃ) মুয়াত্তা মুহাম্মাদের টিকায় লিখেছেন- এক্ষেত্রে ইনসাফের কথা হচ্ছে এক মিসেলের হাদীস সুস্পষ্ট ও সহীহ এবং দুই মিসিলের হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে সু-স্পষ্ট নয়। সহীহ হাদীসের অনুসারী মক্কা মদিনায় ও এক মিসিলের হাদীস মানা হয়।(কোন বস্তুর ছায়া তার সমপরিমাণ লম্বা হলে এক মিছিল বলে)।
প্রচলিত হানাফী মাযহাবে ছায়া দু-মিসিল হলে আসরের নামাযের ওয়াক্ত শুরু হয় এর আগে নয়- এ কথার প্রতিবাদে হানাফী মাযহারের চিফ জাস্টিস আল্লামা আইনী বলেন- দু-মিসিলের সময় নামায আদায় করা জায়েজ তবে দুমিসিলের আগে ওয়াক্ত হয় না। এ কথা ভুল। (ওমদাতুলকারী) অতএব, দুই মিসিলের পরে যেয়ে আসরের আযান দেওয়া, যা-হানাফী মাযহাবের প্রচলন আছে সেটা কখনও সহীহ হাদীস ভিত্তিক নয় এবং বিশ্ব নবী (সঃ) এর আসরের নামাযের সময়ের পদ্ধতিও নয়। **মাগরীরের সময়ঃ** সূর্যাস্তের পর থেকে পশ্চিম আকাশে লাল আভা দুর না হওয়া পর্যন্ত থাকে। (বোখারী, মুসলিম, মেশকাত ৫০ পৃঃ)। রাসুল (সঃ) মাগরিবের নামায সূর্য্যাস্তের পর পরই পড়তেন। নামায পড়ার পর সাহাবীগণ তীর নিক্ষেপ করে সেই তীর পতিত হওয়ার জায়গা স্পষ্ট ভাবে দেখতে পেতেন। (বোখারী, মুসলিম, মেশকাত ৬০ পৃষ্ঠা)।
ঈশার সময় ঃ মাগরীবের সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর থেকে অর্ধ রাত্র পর্যন্ত। (মুসলিম, মেশকাত ৫৯ পৃঃ)। ইশার নামায রাসুল (সঃ) বেশি রাত্রে পড়তে ভাল বাসতেন। (বোখারী, মুসলিম)। চাঁদ উঠে তিন ঘড়ি মারার পর রাসুল (সঃ) ঈশার নামায পড়তেন। (আবু দাউদ, মেশকাত ৬১ পৃষ্ঠা)।
সকল নামায রাসুল (সঃ) প্রথম ওয়াক্তে পড়তেন শুধু ঈশার নামায দেরীতে পড়তেন। আলহামদুলিল্লাহ আহলে হাদীসরাও অন্য সকল নামায সহীহ হাদীস অনুযায়ী আউওয়াল(প্রথম) ওয়াক্তে পড়েন এবং ঈশার নামায একটু দেরীতে পড়ে থাকেন (সর্বত্র এ যুগে মাইক প্রচলিত হওয়ায়) তা কারুরও অজানা নেই।

আযান ও ইকামাতের বিবরণ

আযান অর্থ- আহবান, শরঈ অর্থ হাদীসে বর্ণিত নির্ধারিত আরবী বাক্য সমূহের মাধ্যমে উচ্চ কণ্ঠে মুসলিমদেরকে নামাযের আহবান করাকে আযান বলে। ইকামত অর্থ দাড় করান। উপস্থিত মুসল্লীদেরকে নামাযে দাঁড়িয়ে যাওয়ার হুঁশিয়ার বাণী শুনানোর জন্য ইকামাত দিতে হয়।
রাসুল (সঃ) বলেছেন- যখন নামাযের সময় হয় তখন তোমাদের মাঝে কেউ যেন আযান দেয়। (বোখারী মুসলিম, মেশকাত ৬৬ পৃষ্ঠা)। কেননা শয়তান আযান শুনে ৩৬ মাইল দূরে পলায়ন করে। । আযানের সময় কেবলা মুখি হয়ে।। দুই শাহাদাত আঙ্গুল কানের ভিতরে ঢুকান সুন্নাত (তিরমিযী, আবু দাউদ, ১মঃ ৭৭ পৃষ্ঠা)। আযানের পূর্বে অযু করা সুন্নাত (তিরমিযী ১ম খঃ ৫০ পৃঃ)।
জামাতে হউক বা একাকী হউক সকল অবস্থায় ফরয নামাযে আযান ও ইকামাত দেওয়া সুন্নাত। (নাছাঈ হাঃ নং-৬৬৭)। রাসুল (সঃ) বিল্লাল কে হুকুম করেছিলেন আযানের বাক্যগুলি দু দু বার ও ইকামাতের বাক্যগুলি এক এক বার করে বলার জন্য। (বোখারী মুসলিম)। হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) সহ একদল সাহাবী একই রাত্রে আযান ও ইকামাতের একই স্বপ্ন দেখেন, পরদিন সকালে ওয়াহীর মাধ্যমে প্রত্যাদিষ্ট হলে রাসুল (সঃ) তা সত্যায়ন করেন; এবং বিল্লাল (রাঃ) কে সেই মর্মে আযান দিতে বলেন। (আবু দাউদ হাঃ নং-৬৫০)। আব্দুল্লাহ বিন যায়েদ (রাঃ) বর্ণিত আযানের কলেমা গুলি নিম্নরূপ- আল্লাহু আকবার ৪ বার। আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ২ বার। আশহাদু আন্না-মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ ২ বার। হাই আলাস সালাহ ২ বার। হাই আলাল ফালাহ ২ বার। আল্লাহু আকবর ২বার। লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ ১ বার। অর্থাৎ (ফযরের নামাযে বলা আস্‌সালাতু খায়রুম মিনান্নাউম বাদে) মোট ১৫ কলেমা।
আর আব্দুল্লাহ বিন যায়েদ বর্ণিত ইকামাতের কলেমা নিম্নরূপ- আল্লাহু আকবার ২ বার। আশহাদু আল্লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ ১ বার। আশহাদুআন্না মুহাম্মাদার রাসুলুল্লাহ ১ বার। হাইআলাস সালাহ ১ বার। হাই আলাল ফালাহ ১ বার। কাদকমাতিস সালাহ ২ বার। আল্লাহু আকবার ২ বার। লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ ১ বার। মোট ১১ কলেমা।
গলায় উচ্চ আওয়াজ থাকার কারণে রাসুল (সঃ) বিল্লালকে এভাবে আযান ও আব্দুল্লাবিন যায়েদ (রা) কে এভাবে ইকামত দিতে বলেন। এভাবে ইসলামের ইতিহাসে দুবার করে আযান ও একবার করে ইকামাত দেওয়ার প্রচলন হয়। উল্লেখিত হাদীস সম্পর্কে ইমাম খাত্তাবী (রহঃ) বলেন—

وفيه ثنا الاذان وافراد الاقامة وهو مذهب اكثر علماء الامصار وجرى به العمل فى الحجاز والشام واليمن وديار مصر ونوحى المغرب الى اقصى حجر من بلاد الاسلام وهو قول الحسن البصرى ومكحول والجمهورى ومالك و الاوزاعى والشافعى واحمدبن حمبل واسحاق بن رهويه وغيرهم-

অর্থাৎ - এই হাদীস অনুযায়ী এভাবে দুবার করে আযান ও একবার অর্থাৎ-১১ কলেমা করে ইকামাত দেওয়ার নিয়ম মক্কা, মদিনাসহ সমগ্র হিযায, সিরিয়া, ইয়ামান, মিশর, মরক্কো এবং ইসলামী বিশ্বের প্রত্যন্ত অঞ্চলে চালু আছে এবং এটাই প্রায় সমস্ত উলামায়ে ইসলামের মাযহাব শেষ পর্যন্ত। (দেখুন নাইলুল আওতার ২য়ঃ ৬৪৩ পৃঃ)।

অতএব সহীহ হাদীস অনুযায়ী ইকামাত হবে এক এক বার করে আর এক বারের ধরণটা হচ্ছে উক্ত হাদীস অনুযায়ী ১১ কলেমা। ১০

১০ প্রচলিত মাযহাবী নামাযে ইকামাতের কলেমাগুলি আযানের মত দুবার করে বলা হয় এবং সেটা বিশ্বনবী (সঃ) এর নামাযের ইকামাত বলে প্রমাণ করার জন্য বিশ্ব নবী (সঃ) এর নামাযই হানাফী মাযহাবের নামায নামক বইতে ঐ লেখক প্রথমেই যে দলিলটি এনেছেন তার বইয়ের ২৯ পৃষ্ঠায়, সেটা ৫ম স্তরের কেতাব দ্বারাকুতনী হতে যে ইকামত হবে আযানের মত দু দুবার। কিন্তু ঐ দ্বারাকুতনীতেই দেখুন লেখা আছে -

اسناده ضغيف وعبد الرحمن بن ابى الليلى لم يسمع من معذبن جبل

অর্থাৎ এ হাদীসটির সনদ যঈফ। আর আব্দুর রহমান বিন আবিল লায়লা মুয়াযবিন যাবাল থেকে (ইকামাত হবে আযানের মত দুদুবার) এ কথা শোনেন নাই। (দেখুন দারাকতুনী ১ম খঃ ১৯৫ পৃষ্ঠা।)।

অতএব, মায়ায বিন যাবালের নামে হাদীসটি বানানো হয়েছে।

এরপর তিরমিযীর উদ্ধৃতি দিয়ে তার বই এর ৩১ পৃষ্ঠায় আরও একটি দলিল এনেছেন যে, ইকামাত হবে আযানের মত দুদুবার। কিন্তু দুঃখের বিষয় সেখানেও ইমাম তিরমিযী লিখেছেন- এ হাদীস আব্দুর রহমান বিন আবিল লায়লা আব্দুল্লাহ বিন যায়েদ থেকে শুনেছেন কথাটি কখনও সত্য নয়। (দেখুন তিরমিযী ১ম খঃ ২৭ পৃষ্ঠা)।

এরপর তিনি আরও একটি দলিল এনেছেন নাসাঈ, দারাকুতনী ও ত্বহাবী হতে। দলিলটি আবু মাহযুরা (রাঃ) থেকে এনেছেন। কিন্তু আবু মাহযুরার এই দলিলটি তিরমিযীতেও এসেছে কিন্তু তিরমিযীর উদ্ধৃতি তিনি এই জন্য দেননি। কারণ আবু মাহযুরা থেকে তিরমিযীতে ইকামাতের ব্যাপারে দুরকম বর্ণনা এসেছে। (এক) ইকামাত হবে আযানের মত দু দুবার। (দুই) ইকামাত হবে এক এক বার করে। (দেখুন তিরমিযী ১মঃ ২৭ পৃঃ)।

অতএব আবু মাহযুরার হাদীসের মধ্যে ইজতেরাব (একই বর্ণনাকারী দু'রবকম বলেছেন) রয়েছে। ইকামাত হবে আযানের মত দুদুবার এ কথা যেসব জায়গায় এসেছে তার একটাও সহীহ নয়। (দেখুন

নাইলুল আওতার ১মঃ ২৭৩ পৃষ্ঠা।) আর উসুলের দৃষ্টিতে হানাফী মাযহাবের সাক্ষ্যও পাওয়া যায় যে বোখারী মুসলিমের হাদীস সবচেয়ে সহীহ এবং অগ্রগণ্য।সুতরাং ইকামাত হবে এক এক বার এটা বোখারী মুসলিমের মুত্তাফাকুন আলাইহীর হাদীস। (যে হাদীসে বোখারী মুসলিম একমত তাকে মুত্তাফাকুন আলাইহীর হাদীস বলে) হানাফী ফেকাহর কেতাবেও আযান দু দু'বার করে এবং ইকামাত এক একবার করে এ কথার স্বীকৃতি পাওয়া যায়। যেমন ফেকাহ নূরুল হেদায়ার ভিতরে এসেছে, আযানের কলেমা দুদুবার আর ইকামাতের কলেমা এক একবার এটা সহীহ হাদীস থেকে প্রমাণিত। (ফেকাহ নূরুল হেদায়া উর্দু তরজমা শরহে বেকায়া ৮৭ পৃষ্ঠা।)

ইমাম হাফেজ যায়লয়ী হানাফী (রহঃ) বলেন- হাদীসের হাফেজগণ বলেন– দুবার করে ইকামাত দেওয়ার হাদীসের শব্দগুলো সুরক্ষিত নয়।(দেখুন নছবুররায়া ১মঃ ২৭৩ পৃষ্ঠা)।

তাই বলছি মুফতী সাহেব বিশ্বনবী (সঃ) এর নামাযই হানাফী মাযহাবের নামায এই বুলি আওড়ায়ে লোকদের সহীহ হাদীসের উপর আমল করা থেকে বিরত রাখলে কেয়ামতের দিন এর জন্য জবাবদিহী করতে হবে সেটা যেন ভুলে যাবেন না।

আজ আপনি বেঁচে গেলেন যে, এদেশে কোন শাফেয়ী, মালেকী বা হাম্বংলী মাযহাবের লোক নেই। নইলে তারা আপনার বইয়ের ঐ শিরোনাম যে, বিশ্বনবী (সঃ) এর নামাযই হানাফী মাযহারের নামায দেখে বলত মুফতী সাহেব অসুস্থ মস্তিষ্কের লোক। কারণ যে ব্যক্তি প্রচার করে বেড়ায় যে, ৪ মাযহাব হক্বের উপর আছে সে ব্যক্তি অসুস্থ মস্তিষ্কের না হলে কি করে বলে যে বিশ্বনবীর নামাযই একমাত্র হানাফী মাযহারের নামায?

আপনি হানাফী মাযহাবের একজন মুফতী। আপনার মাযহারের নামাযের মাসলার সঙ্গে তাদের মাযহাবের নামাযের মাসলার অনেক ব্যতিক্রম আছে। আপনার মাযহাবে নামাযের বহু মসলা যঈফ হাদীসের উপর প্রতিষ্ঠিত। আর তাদের নামাযের মসলা গুলির ভিত্তি প্রায় সবই সহীহ হাদীসের উপর যে কথা আপনার ফেকাহ হেদাযার দেরায়াতে ইবনে হাযার আসকালানী (রহঃ) ও মুসলিম শরীফের মধ্যে ইমাম নব্বী (রহঃ) দেখুন তা ফাঁস করে দিয়েছেন। যেমন ঃ- আপনার মাযহাবে ইবনে আবি শায়বার যইফ হাদীস অনুযায়ী নাভির অনেক খানি নীচে হাত বেধে নামায পড়তে আপনার বড় ভাল লাগে। আর তারা সবাই নামাযে মহান আল্লাহ যিনি বাদশাহর বাদশাহ তার দরবারে হাযীর হয়ে কাকুতী মিনুতি ভরে জড়ো সড়ো হয়ে বোখারী মুসলিমের সহীহ হাদীস অনুযায়ী বুকের উপর হাত বেধে (যেমন কেউ কোন ম্যাজিস্টেটের সামনে হাত বুক সমান উচু করে ক্ষমা প্রার্থী হয়ে জড়সড়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকেন) তাঁর গুনোও কীর্তন শুরু করতে তাদের বড় ভাল লাগে। আপনি নামাযে রুকুর সময় এবং রুকু থেকে ওঠার সময় ইবনে আবিশায়রা, তিরমিযী আবু আওয়ানা, দারাকুতনীর যঈফ হাদীস অনুযায়ী রফউল ইয়াদাইন করেন না। আর তারা সবাই বোখারী মুসলিমের সহীহ হাদীস অনুযায়ী নামাযে রুকুর সময় ও রুকু থেকে ওঠার সময় রফউল ইয়াদাইন করে থাকেন। আপনি নামাযে আমীন তিরমিযী, ইবনে আবি শায়রা, দারা কুতনীর যঈফ হাদীস অনুযায়ী আস্তে বলে থাকেন। আর তারা সবাই বোখারী মুসলিমের সহীহ হাদীস অনুযায়ী নামাযে আমীন জোরে বলে থাকেন ইত্যাদি। প্রায় সব বিষয়ই ব্যতিক্রম। এইজন্য তারা আপনার মস্তিষ্কে অসুস্থতা আছে এ কথা বলা ছাড়া তাঁদের আর কোন উপায় থাকত না। আর আমি বলছি, কেয়ামতের দিন আল্লাহর সামনে জবাবদিহী করার জন্য আপনার বই এর ঐ শিরোনামটিই যথেষ্ট হবে যে, বিশ্ব নবী (সঃ) এর নামাযই হানাফী মাযহারের নামায। আপনার মাযহাবের অধিকাংশ পদ্ধতি যে যঈফ হাদীসের উপর ভিত্তি করে করা হয়েছে তা শুধু আমি নই আপনাদের যে প্রাণ প্রিয় ফেকাহ হেদায়ার নিচে দেরায়াটা খুল্লেই দেখুন তার প্রমাণ হাতে নাতে পাবেন। তাই বলছি শাফেয়ী মালেকী হাম্বলীদের নামাযের পদ্ধতি গুলি সহীহ হাদীস ভিত্তিক হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা এ ধরনের শিরোনাম দিয়ে কোনো বই রচনা করতে আজ পর্যন্ত সাহস পায় নাই যে বিশ্বনবী (সঃ) এর নামাযই শাফেয়ী অথবা মালেকী অথবা হাম্বালী মাযহারের নামায। আল্লাহ মাফ করুন।

মেয়েরাও নামাযের জন্য ইকামাত দিবে কেন না নামাযে নারী-পুরুষের মধ্যে পদ্ধতিগত দিক দিয়ে কোন পার্থক্য নেই। সহীহ হাদীসে এসেছে মা আয়শা (রাঃ) আযান ও ইকামাত দিতেন এবং মেয়েদের নামাযে ইমামতি করতেন। (আলমুস্তাদরাক, ইবনে আবি সায়বা বায়হাকী ১ম খন্ড ৪০৮ পৃষ্ঠা)। হাদীস সহীহ। আযান একামাত এমন অনুচ্চস্বরে দিতে হবে যেন মেয়েদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। আয়শা ও উম্মে সালমা যখন মেয়েদের ইমামতি করতেন তখন তাদের মাঝখানে দাঁড়াতেন। (বায়হাকী, ইবনে আবি সায়াবা ১ম খন্ড ২২৩ পৃষ্ঠা)। হাদীস সহীহ।

তারজী আযান

আযানের ভিতরে দুই শাহাদাত কলেমা কে প্রথমে দু'বার করে মোট ৪ বার করে নিম্নস্বরে অতঃপর দুবার করে ৪ বার উচ্চস্বরে বলাকে তারজী আযান বলা হয়। তারজী আযান ওটা জায়েজ। ১১

১১ বিশ্বনবী (সঃ) এর নামাযই হানাফী মাযহাবের নামায নামক বই এর লেখক– তারজী আযান অস্বীকার করলেও হানাফী ফেকাহর স্বাক্ষ্য কিন্তু তারজী আযানের পক্ষে। তাই ফেকাহ আইনুল হেদায়ার মধ্যে লেখা হয়েছে যে তারজী আযান হাদীস থেকে প্রমাণিত। (দেখুন আইনুল হেদায়া ১মঃ ২৯২ পৃষ্ঠা)। হানাফী মতে তারজী আযান মোবাহ মাকরুহ নয়।(ফেকাহ বাহরুর রায়েক ১মঃ ১৫৬ পৃষ্ঠা)।

তবে আব্দুল্লাহ বিন যায়েদ বর্ণিত বেলালী আযান ও ইকামাত হচ্ছে সব চেয়ে অগ্রগণ্য ও উত্তম, যেটা ইসলামের সূচনা লগ্ন থেকে মক্কা মদিনাসহ সর্বত্র চালু আছে।

জুমআর আযান

শুক্রবার দিবসে জুমআর নামাযের নির্মিত্ত ঃ রাসুল (সঃ) খোৎবা পাঠের জন্য মিম্বরে বসে হযরত বিলালকে মসজিদের দরজার পার্শে দাঁড়িয়ে আযান দিতে বলতেন। (বোখারী)।

রাসূল (সঃ) এর যুগে এবং আবু বাকার ও ওমর ও ওসমান (রাঃ) এর খেলাফাতের প্রথমার্ধে জুমআর দিন একই আযান প্রচলিত ছিল। হযরত ওসমান (রাঃ) মদিনা শহরে লোক সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার কারণে মসজিদে নব্বী হতে প্রায় অর্ধ মাইল দুরে যাওরা নামক বাজারে লোকদের হুঁশিয়ারী করানোর জন্য দ্বিতীয় ডাকের (আযানের) ব্যবস্থা করেন। (বোখারী মুসলিম মেশকাত হাদীস নং-১৪০৪)। খলিফার এ হুকুম ছিল স্থানীয় প্রয়োজনের কারণে। তাই সর্বত্র এ যুগে মাইক প্রচলিত হওয়ায় এ নিয়ম চালু রাখার পিছনে কোন যুক্তি নেই, সর্বোপরি রাসুল (সঃ) এর আচরিত সুন্নাতের অনুসরণই হচ্ছে মু'মিনের কাম্য। অতএব জুমআর দিনে ইমাম খোৎবার জন্য মেম্বরে বসলে দরজার পার্শে, উপরে বা সম্মুখে একটি আযান দেয়াই হচ্ছে বিশ্বনবী (সঃ) এর পদ্ধতি বা সুন্নাত। ১২

১২ প্রচলিত হানাফী মাযহাবের জুমআর দিন দুই আযান দেওয়া হয় এবং আহ্‌লে হাদীসদেরকে এ ব্যাপারে দোষারোপ করা হয় যে, হযরত ওসমান একজন জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত সাহাবী ও খোলাফায়ে রাশেদীনের একজন অন্যতম সদস্য তিনি এটা চালু করেছেন তাকে তারা মানে না। পাঠকগণ, ওসমানী আযান এখন পুরো বেদাতে পরিণত হয়েছে এটা এখন মোটেই চলবে না।। কারণ (১) হযরত ওসমান (রাঃ) লোকদেরকে জুমআর জন্য হুশিয়ারী করানোর ব্যাপারে যে আযান নিজের পক্ষ থেকে চালু করে ছিলেন ওটা যাতে শরীয়তের ভিতরে ঢুকে না পড়ে তার জন্য তিনি মসজিদে নব্বী থেকে অর্ধ মাইল দুরে দিয়ে ছিলেন। (বোখারী ১মঃ ১২৫ পৃষ্ঠা)। (২) হযরত ওসমান (রাঃ) যাওরা নামক বাজারে যে আযান দিয়েছিলেন, ওটা নামাযের আযানের মত ছিল না ওটা নাম-যের জন্য যেমন রাস্তায় ডাকাডাকি হাকাহাকি (আরবীতে ডাকাডাকি হাকাহাকিকেও আযান বলা হয়) করে ও শব্দ গুলি ঐ রকমই ছিল। (দেখুন ফতহুল বারী ২য়ঃ ৩৯৭ পৃষ্ঠা)। তাই ওসমান (রাঃ) এর অর্ধ মাইল দুরে দেওয়া হাক ডাককে পূরা আযানের শব্দে পরিণত করে মসজিদে এনে ছিলেন আহ্‌লে বাইয়্যেতের দুশমন মারওয়ানী খলিফা হিসাম বিন আব্দুল মালেক। (দেখুন হানাফী ফেকাহ্ ওমদাতুর রেয়ায়া ১মঃ ১৯৩ পৃষ্ঠা)। আর মক্কাতে চালু করেছিলেন ইসলামের জালেম বাদশা হাজ্জাজবিন ইউসুফ। আর বসরাতে চালু করেছিলেন হযরত হুসাঈনের খুনি ইবনে যিয়াদ।(দেখুন হাদীসে, খায়ের ও শর)।

হযরত ওসমান (রাঃ) এর চালু করা আযানকে হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রা) এবং হাসান বসরী ঐ সময়ই বেদাত বলেছিলেন। (দেখুন ফতহুল বারী ৪৫৮ পৃঃ ১৭) । বিস্তারিত আমার লেখা ওসমানী আযান ও তার কারণ সমূহ নামক পুস্তিকার মধ্যে পাবেন।

অতএব, জুমআর দিনে মসজিদে দুই আযান দেওয়া কখনও বিশ্বনবী (সঃ) এর জুমআর আযানের পদ্ধতি নয়। বিশ্বনবী (সঃ) এর জুমআর আযানের পদ্ধতি হচ্ছে তিনি যখন খোৎবার জন্য মেম্বরে বসতেন তখন দরজার উপর ১টি আযান দেওয়া। দেখুন বোখারী, মুসলিম)।

পাঠকগণ বিশ্বনবী (সঃ) এর জলন্ত সুন্নাত সামনে থাকতে আর কারুর কথায় কান দেওয়া যাবে না। তাহলে "আশহাদুআল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু অ-আশাহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসুলুহু।" এটা অর্থহীন হয়ে পড়বে। আল্লাহ সবাইকে হেফাজাত করুন। আমীন।

আযান ও ইকামাতের জওয়াব

রাসুল (সঃ) বলেন– যে ব্যক্তি খালিস দিলে আযানের জওয়াব দিবে তার জন্য জান্নাত ওয়াযেব হয়ে যায়। (মুসলিম, মেশকাত ৬৬ পৃঃ)।

মুয়াজ্জিন আযানে যে যে শব্দ বলবেন শ্রবনকারীদের ও তাই তাই বলতে হবে। (বোখারী মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী)। শুধু হাইয়্যা আলাস সালাহল, হাইয়্যা আলাল ফালাহ্ শুনে -লা হাওলা আয়ালা কুউয়াতা ইল্লাহ বিল্লাহ বলতে হবে। (মুসলিম নাইলুন আওতার ২য়ঃ ৫৩ পৃঃ)। ইকামাতের জওয়াব ও আযানের মত। ইকামাত সম্পূর্ণ শেষ হওয়ার পরই ইমাম নামায শুরু করবেন। এটাই সুন্নত। অনেক হানাফী মসজিদে দেখা যায় ইকামাত শেষ না হতেই ইমাম নামায শুরু করেন এটা সুন্নাত বিরোধী মনগড়া পদ্ধতি বিশ্বনবী (সঃ) এর পদ্ধতি নয়।

আযানের দোয়া

আযান শেষ হলে প্রথমে দুরুদে ইবরাহীম পড়তে হবে। (মুসলিম)। তারপর ওয়াসিলার দোয়া। রাসূল (সঃ) বলেছেন আযান শুনে যে ব্যক্তি এই দোয়া পড়বে।

اللهم رب هذه الدعوة تامة والصلاة القائمة ات محمدا

وسيلة والفضيلة وابعثه مقام محمودا الذي وعدته

উচ্চারণ ঃ আল্লা-হুম্মা রাব্বা হা-যিহিদ্ দা'ওয়াতিত তা-ম্মাহ, ওয়াস্ সালা-তিল ক্বা-য়িমাহ, আ-তি মুহাম্মাদানিল্ ওয়াসী-লাতা ওয়াল্ ফাযী-লাহ্, ওয়াব্আছহু মাকা-মাম্ মাহমূদানিল্ লাযী ওয়াদ্তাহ।

অর্থ ঃ এসব পরিপূর্ণ আহবান ও প্রতিষ্ঠিত নামাযের প্রভু হে আল্লাহ! মুহাম্মাদ (সাঃ) -কে (জান্নাতের) ওয়াসীলাহ (নামক স্থানটি) ও সম্মান দান কর এবং তুমি তাকে সেই মাকামে মাহমুদে (প্রশংসিত জায়গায়) পৌছিয়ে দাও, যা তাকে দেওয়ার তুমি ওয়াদা করেছ। তার জন্য আমার শাফায়াত হালাল হয়ে যায়। (সেহা সেত্তা, মেশকাত ৬৫ পৃষ্ঠা)। ১৩

১৩ দুঃখের বিষয় হানাফী মাযহাবের কিছু পন্ডিত সাহেবরা হাদীসটির ভিতর কিছু মনগড়া শব্দ ঢুকিয়ে বেদাত সৃষ্টি করেছেন। যেমন- ওয়াসিলার পর দারাজাতার রফিয়া এবং ওয়াত্তা শব্দের পর ওয়ার ঝুকনা শাফা আতাহু ইয়াত্তমাল কিয়ামাহ বাড়িয়ে দিয়ে রাসুল (সঃ) এর হাদীসকে বিকৃত করেছেন। (হাদীসটি দেখুন বোখারী, মুসলিম, মেশকাত ৬৫পৃঃ। হাফেজ ইবনে হাযার আসকালানী ও মোল্লা আ-লিকারী হানাফী বলেন- অদ দারাজাতার রাফিয়া-এ সব শব্দ গুলির কোন প্রমান হাদীসের পাতায় নেই। (দেখুন তালখিছুল হাবীব ১ম খন্ড ৭৮ পৃষ্ঠা, মাওযুয়াতে কাবীর ৩৮ পৃষ্ঠা। আর হাদীস বিকৃতি সম্পর্কে রাসুল (সঃ) এর কঠোর হুশিয়ারী, যে ব্যক্তি আমার নামে মিথ্যা বলে যা আমি বলি নাই। তার ঠিকানা আগুন করে নিক। বোখারী, মেশকাত ৩২ পৃষ্ঠা।

কেব্‌লার বিবরণ

রাসুল (সঃ) যখনই ফরয নামায পড়তেন তখনই কেবলা মুখী হয়ে দাঁড়াতেন। (ফিকহুস সুন্নাহ ১মঃ ১৬৭ পৃঃ)। কেবলা নির্ণয় করতে না পারলে যে দিক কেবলা বলে বেশী ধারনা হবে সে দিকে মুখ করে নামায আদায় করতে হবে। নামাযের পর সঠিক কেবলা অন্য দিকে জানতে পারলেও নামায ফিরে পড়তে হবে না।(বোখারী ১মঃ ৫৮ পৃষ্ঠা)। নামাযরত অবস্থায় কেবলার সঠিক খবর জানতে পারলে সাথে সাথে কেবলা মুখি হতে হবে।(সুরা বাকারা ১৫০ নং আয়াত)।

সুতরার বিবরণ

নামাযীর সামনে আড়াল করা জিনিষকে সুতরা বলে। রাসুল (সঃ) সর্বদায় সামনে সুতরা রেখে নামায আদায় করতেন। তাই সুতরা রাখা ওয়াযেব। নামাযী ও সুতরার মধ্যে দুরত্ব ৩ হাত হতে হবে। (বোখারী, মুসলিম, নাইলুল আওতার ২মঃ ২৪৭ পৃঃ)। রাসুল (সঃ) বলেন-নামযীর সামনে সুতরার মধ্যে কেউ অতিক্রম করলে বাধা দিবে, প্রয়োজনে লড়াই করবে। মুক্তাদীর সুতরা লাগে না ইমামের সুতরাই যথেষ্ট। (বোখারী মুসলিম, মেশকাত ৭৪ পৃষ্ঠা)। তাই সামনের কাতার

খালি থাকলে মুক্তাদীর সামনে দিয়ে হেটে যেয়ে পুরণ করলে কোন গুনাহ হবে না।

মসজিদে প্রবেশের নিয়ম ও দুখুলুল মজজিদ

মসজিদে প্রবেশের সময় আগে ডান পা দিতে হবে। আর বের হওয়ার সময় বাম পা আগে দিতে হবে। (তাবারানী) । মসজিদে ঢোকার সময় পড়বে اللهم। افتح لى ابواب رحمتك "আল্লাহু ম্মাফ তাহলী আবওয়াবা রহম-াতিকা"। হে আল্লাহ তুমি আমার সামনে তোমার রহমতের দরজা গুলি খুলে দাও। আর বের হওয়ার সময় পড়বে اللهم انى اسئلك من فضلك। আল্লাহুম্মা ইন্নি আস আলুকা মিন ফাযলিকা। হে আল্লাহ আমি তোমার কাছে তোমার অনুগ্রহ প্রার্থনা করছি।(মুসলিম মেশকাত ৬৮ পৃষ্ঠা)।

রাসুল (সঃ) বলেছেন কেউ মসজিদে প্রবেশ করলে সে যেন দু রাকাত নামায বসার পূর্বে পড়ে নেয়।(বোখারী মুসলিম মেশকাত ৬৮ পৃষ্ঠা)। হানাফী মাযহাবে প্রচলন আছে মসজিদে ঢুকে নামায না পড়ে বসা এটা কখনও বিশ্বনবী (সঃ) এর পদ্ধতি নয়। এটা সুন্নাত বিরোধী বেদাত। এমন কি জুমআর দিন খোৎবার সময় হলেও ২ রাকাত নামায না পড়ে বসা হাদীসে নিষেধ রয়েছে। (বোখারী, ১মঃ ১২৭ পৃষ্ঠা)। ১৪

১৪ প্রচলিত মাযহাবী বেওয়াজ রাসুল (সঃ) এর সুন্নাত কে কিছু মুফতীদের সামনে জীবিত কবর রয়েছে। হযরত জাবের (রা) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি জুমআর ওয়াক্তে আসলেন এমন সময় যখন রাসুল (সঃ) খোৎবা দিচ্ছিলেন। রাসুল বললেন ওহে তুমি বসেছ? নামায কি পড়েছ? সাহাবী বল-লেন না। তখন রাসুল (সঃ) খোৎবারত অবস্থায় বললেন- ওঠ নামায পড় দু-রাকাত। মাযহাবী ধাঁধা হাদীস উল্টানোর জন্য বাহানা ফিট, করেছে যে, ঐ ব্যক্তি গরীব ছিল তাই তার জীর্ণ শীর্ণ অবস্থাটা দেখানর জন্য নামাযের অযুহাতে তাকে খাড়া করেছিলেন। আমাদের খোৎবার সময় নামায পড়ার দরকার নেই। কি হাস্যকর যুক্তি, এই বাহানা দেখিয়ে এই সহীহ হাদীস খানা উল্টানে ওয়ালাদের মুখ বন্ধ করার জন্য আল্লাহ পাক তার রাসুল (সঃ) এর পাক জবানে আগেই বলে রেখেছেন সুতরাং মুসলিম শরীফের মধ্যে এসেছে তাকে নামায পড়ার হুকুম দেওয়ার পর পরই রাসুল (সঃ) সকলের উদ্দেশ্যে বললেন- হে সাহাবীগণ তোমাদের ভিতরে কেউ যদি এমন অবস্থায় আসে যে ইমাম খোৎবা দিচ্ছেন তখন সে যেন আগে দু-রাকাত নামায় পড়ে নেয়। তারপর যেন বসে। (দেখুন মুসলিম ১মঃ ২৮৭ পৃষ্ঠা)।

পাঠকগণ, জুমআর খোৎবার সময় কেউ যদি আসে তাহলে হানাফী মাযহার মতে তাকে দু-রাকাত নামায পড়তে দেওয়া হয় না, বসতে বলা হয়, রাসুল (সঃ) এর সহীহ হাদীসের বিরুদ্ধে এ কোন বিশ্বনবীর পদ্ধতি আবার দেখি হানাফী মাযহাবের ফেকাহর মধ্যে লেখা হয়েছে যে, জুমআর খোৎবার সময় মসজিদে এসে দু রাকাত নামায পড়া হাদীস থেকেই প্রমাণিত। (দেখুন-হানাফী ফেকাহ দুরুল হেদায়া ১৪৮ পৃষ্ঠা। আইনুল হেদায়া ১মঃ ২৮৭ পৃষ্ঠা)। অতএব, খোৎবার সময় এসে ২ রাকাত নামায না পড়ে বসা এটা কখনও বিশ্বনবী (সঃ) এর পদ্ধতি নয়।

নামাযের ফরয রাকাত সমূহ

পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামায মোট ১৭ রাকাত। (১) ফজর ২ রাকাত (২) যোহর ৪ রাকাত (৩) আসর ৪ রাকাত (৪) মাগরীব ৩ রাকাত ও (৫) ঈশা ৪ রাকাত। (বোখারী মুসলিম, মেশকাত ৭৯ পৃষ্ঠা)।

সুন্নাত নামাযের বিবরণ

রাসুল (সঃ) বলেন- পুরুষের ফরয ব্যতীত সর্বোত্তম নামায হল তার ঘরে আদায় করা নামায।(বোখারী মুসলিম, বুলগুল মারাম-১১৬ পৃষ্ঠা)। রাসুল (সঃ) বলেন–যে ব্যক্তি দিবারাত্রে ১২ রাকাত (সুন্নাত) নামায পড়ে তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর বানান হয়। আর তাহলো যোহরের পূর্বে ৪ রাকাত ও পরে ২ রাকাত। মাগরীবের পরে ২ রাকাত, ঈশার পরে ২ রাকাত ও ফজরের পূর্বে ২ রাকাত।(মুসলিম তিরমিযী মেশকাত ১০৩ পৃষ্ঠা)। জুমআর পূর্বে দু- রাকাত করে যা পার পড়া যায়। (বোখারী ১ম ১২১ পৃঃ)। আর জুমআর পরে মসজিদে হলে ৪ রাকাত, বাড়ীতে হলে ২ রাকাত পড়তে হয়। (বোখারী মুসলিম, মেশকাত ১০৪ পৃষ্ঠা)। রাসুল (সঃ) বলেন, তোমরা মাগরীবের আযানের পর ফরয নামাযের আগে ২ রাকাত নামায পড়। এও সুন্নাত। (বোখারী, মুসলিম, মেশকাত ১০৪ পৃষ্ঠা)। হযরত আনাস বলেন আমরা রাসুল (সঃ) এর যুগে এ সুন্নাত পড়তাম। (বোখারী, মুসলিম, মেশকাত ১০৪ পৃষ্ঠা)। (কিছু ভাইদের সহীহ হাদীসের সঙ্গে সম্পর্ক না থাকায়, মাগরিবের আযানের পর জামাতের আগে এ নামায পড়তে দেখলে তারা আশ্চর্যান্বিত হয়ে যান)। সুস্থ অবস্থায় ফরয নামায বসে পড়লে তা হবে না তবে সুন্নাত পড়া যাবে কিন্তু দাঁড়িয়ে পড়ার অধেক নেকি হবে।(বোখারী হাঃ নং-১১১৫)।

বেতের নামাযের বিবরণ

বেতের নামায সুন্নাত, যা রাসুল (সঃ) কর্তৃক প্রবর্তিত। (নাসাঈ, তিরমিযী হাকেম, বুলুগুল মারাম ১০৭ পৃঃ)। বেতের এক, তিন, পাঁচ, সাত ও নয় রাকাত পর্যন্ত পড়া যায়।(বোখারী, মুসলিম, মেশকাত, ১১১-১১২ পৃষ্ঠা)। রাসুল (সঃ) এক রাকাত বেতের পড়তেন (বাখারী মুসলিম)। ৯ ও ৭ রাকাত পড়লে যথাক্রমে ৮ ও ৬ রাকাতে আওহিয়্যাত পড়ে সালাম না ফিরিয়ে আবার উঠে ১ রাকাত পড়ে আত্তাহিয়্যাতু দুরুদ দোয়া মাসুরা পড়ে সালাম ফিরাতে হবে।(মুসলিম, মেশকাত ১১১ পৃঃ)। বেতের ৫ রাকাত হলে রাসুল (সঃ) ৫ রাকাতে শুধু একটা বৈঠক করে আত্তাহিয়্যাত, দরুদ ইত্যাদি পড়ে সালাম ফিরাতেন। ফাঁকে বসতেন না।(বোখারী মুসলিম মেশকাত ১১১ পৃষ্ঠা)। আর ৩ রাকাত হলে মা আয়শা (রঃ) বলেন, রাসুল (সঃ) ৩ রাকাত বেতেরে তৃতীয় রাকাতে শুধু বসতেন। ২ রাকাত পরে বসতেন না। (

হাকেম বায়হাকী ৩য় খঃ ৩১ পৃষ্ঠা)। আবু হুরায়রা (রা) বলেন রাসুল (সঃ) বলেছেন তোমরা ৩ রাকাত বেতের মাগরিবের মত পোড়না। (অর্থাৎ ২ রাকাত পর বসবে না। (দারা কুতনী, নাছবুর রায়াহ খঃ ১১৫ পৃঃ)। ৩ রাকাত বেতের ২ রাকাত পরে বসার কোনো সহীহ হাদীস নেই। (নছবুর রায়াহ ২য় খঃ ১২০ পৃষ্ঠা)।

প্রচলিত হানাফী মাযহারে ৩ রাকাত বেতের পড়া হয় কিন্তু হাদীসের খেলাফ ২ রাকাত পরে বৈঠক করে এবং ২ রাকাত হতে ওঠার পর নতুন করে নিয়ত বাঁধেন। এটা কখনও বিশ্ব নবী (সাঃ) এর পদ্ধতি নয়। অথচ তাদের ফেকাহোর মধ্যে লেখা হয়েছে ১ রাকাত বেতের হাদীস থেকে প্রমাণিত এবং এর উপর ইজমা হয়েছে । ১৫

১৫ প্রচলিত হানাফী মাযহাবের অনুসারীগণ ১ রাকাত বেতের কেমন তা শুনে আশ্চর্য্য বোধ করেন। (দেখুন হেদায়া ১ম খন্ড, ৫৬৯ পৃঃ)এখন তার হাদীস তো দেখলেন, এখন শুনুন কারা কারা ১ রাকাত বেতের পড়তেন তা দেখা যাক। সাহাবীদের মধ্যে ৪ খলিফা সহ সায়াদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস, মোয়াযবিন যাবাল, উবায়বিন কায়াব, আবু মুসাআশয়ারী, আবুদ দারদাহ, হুযায়ফা, ইবনে মাসউদ, ইবনে ওমর, ইবনে আব্বাস, আমীর মুয়াবীয়া, তামিমাদ্দারী, আবু আইয়ুব আনসারী, আবু হুরায়রা, ফোযায়রা ইবনে খোবায়েব (রাঃ)। আর তাবেয়ীদের মধ্যে ইমাম যুহুরী, হাসান বসরী, মুহাম্মদ বিন শিরীন, সাইদ বিন যুবায়ের সহ অসংখ্য তাবেয়ী এবং প্রচলিত ৪ মাযহাবের ৩ ইমাম শাফেয়ী, মা-লেকী, হাম্বলী এঁরা সবাই ১ রাকাত বেতের পড়ার পক্ষপাতি। (দেখুন নাইলুল আওতার ২য় খঃ ২২৭ ও ২২৮ পৃষ্ঠা)। রাসুল (সঃ) ১ রাকাত বেতের পড়তেন এ ব্যাপারে বহু সহীহ হাদীস বিদ্যমান (দেখুন, বোখারী , মুস-লিম, মেশকাত ১০৫-১১১ পৃষ্ঠা)। রাসুল (সঃ) বেশির ভাগ সময় বেতের ১ রাকাতই পড়তেন। (দেখুন যাদুল মায়াদ ১মঃ ১৫৬ পৃষ্ঠা)।

দু'আ কুনুতের বিবরণ

দু'আ কনুত দুই প্রকার ঃ ১. কনুতে নাযিলা যা বিপদাপদের সময় পড়া হয়, এটা রুকুর পরে। (বুখারী, মুসলিম) হাঃ (৬৭৭) ২. বিতরের কনুত, এটা রুকুর আগে এবং পরে উভয় অবস্থায় পড়া যায়। (তুহফাতুল আহ্ওয়াযী- ২/৫৬৬)। তবে রুকুর পূর্বে পড়া উত্তম। কারণ এভাবে নবী (সাঃ) নিজে পড়েছেন এবং হাসান (রাঃ) কে শিক্ষা দিয়েছেন। (আবু দাউদ, নাসাঈ ইবনে মাজাহ)।

নবী (সাঃ)-এর নাতি হাসান (রাঃ) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (রাঃ) আমাকে এই (নিম্নের) কুনুত শিক্ষা দেন। (তুহ্ফাতুল আহওয়াযী ২য় খন্ড, ৫৬৭ পৃঃ)। ইমাম তিরমিযী (রহ.) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হতে এর চেয়ে উত্তম কোন কুনুত আমরা জানি না। (তিরমিযী ১ম খন্ড, ১০৬ পৃঃ)। হানাফী ফেকাহোর ভিতরে ও লেখা হয়েছে

(الخ) .... اللهم اهدنى এ দোয়া কুনুত হাদীস থেকে প্রমাণিত। (দেখুন হেদায়া ১ম খন্ড ৫২১ পৃঃ)।

দো'আ কুনুত

اللهم اهدنى فيمن هديت وعافنى فيمن عافيت وتولنى فيمن توليت وبارك لى فيما اعطيت وقنى شرما قضيت فانك تقضى ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعزمن عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصلى الله على البنى–

দু'য়া কুনুত প্রত্যহ পড়া ওয়াজিব নয়।(তুহফাতুল আহওয়াযী ২য় খঃ ৫৬৫ পৃঃ) তাই রসূল-ুল্লাহ (সঃ) এর সুন্নাত অনুযায়ী কখন কখন বাদ দেয়া ভাল। (ফিকহুস সুন্নাহ ১ম খঃ৩৯১ পৃঃ)

নামাযের জন্য মুসাল্লায় দাঁড়ান

আল্লাহ বলেন- قوموا لله قانتين অর্থাৎ তোমরা আল্লাহর জন্য বিনীত ভাবে দাঁড়াও।

নামাযে কাতার বন্দি হয়ে দাড়ান সম্পর্কে রাসুল (সঃ) বলেন–

عن ابن عمر (رض) ان رسول الله ﷺ قال اقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وصدوا الخلل ولا تذروا فرجات الشيطان ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطع الله

অর্থাৎ ঃ- তোমরা কাতার সোজা কর। মধ্য খানে ফাঁক বন্ধ কর। শয়তানের জন্য কোন ফাঁক রাখবে না। যে ব্যক্তি কাতারে সংযোগ স্থাপন করে আল্লাহ ও তার সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে। আর যে কাতার ছিন্ন করে আল্লাহ ও তার সঙ্গে সংযোগ ছিন্ন করে। (আবু দাউদ ১মঃ ২৯৭ পৃঃ, মুসতাদ রাকে হাকিম ১মঃ ২২৩ পৃষ্ঠা)।

عن جابر بن سمرة (رض) قال رسول الله (ص) الا تصفون كما تصف الملئكة عند ربهم قلنا وكيف تصف الملئكة عند ربهم قال يتمون الصف المقدمة ويترصون فى الصف

অর্থাৎ জাবের বিন সামুরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসুল (সঃ) বলেছেন- তোমরা

কি ফেরেসতাদের মত কাতার বাধ না? আমরা বললাম ফেরেসতারা তাদের প্রভুর সামনে কেমন ভাবে কাতার কাধে? রাসুল (সঃ) বললেন- তারা আগে প্রথম কাতার পূর্ণ করে এবং কাতারে এক জনের সঙ্গে আর একজন এমন ভাবে (পা এবং কাঁধ) মিলিত রাখে যেমন ভাবে দালান তৈরীর সময় এক ইটের সহিত অপর ইট বালি সিমেন্ট দ্বারা সংযুক্ত হয়। (বোখারী মুসলিম, আবু দাউদ, ইবনে মাযা)।

রাসুল (সঃ) এর এই নির্দেশ শোনার পর সাহাবীগণ একে অপরের সঙ্গে কাঁধের সাথে কাঁধ ও পায়ের সঙ্গে পা মিলিয়ে দিতেন।তাই হযরত আনাস(রা) এর শাক্ষ্যঃ-

كان احدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه

অর্থাৎ ঃ - রাসুল (সঃ) যখন এ কথা বলতেন- তখন আমাদের (সাহাবীগণ) প্রত্যেকে তার সাথীর কাধের সাথে কাধ এবং পায়ের সাথে পা মিলিয়ে দাঁড়াতেন। (বোখারী ১ম-১০০ পৃঃ) ।১৬

১৬ বিশ্বনবী (সঃ) এর নামাযই হানাফী মাযহারের নামায নামক বই এর লেখক লিখেছেন হাদীসে পায়ের সঙ্গে পা মিলানোর কথা এসেছে এটা রাসুল (সঃ) এর কথা নয়, এটা দু একজন সাহাবীর ব্যক্তিগত আমল।

পাঠকগণ, লক্ষ করুন, হাদীসের মধ্যে এসেছে রাসুল (সঃ) বলেছেন - وحاذوا بين المناكب*। কাঁধ বরাবর কর* وصدوا الخلل *দুজনের মধ্য খানের ফাঁক বন্দ কর।* ولاتذروا فرجات الشيطان *শয়তানের জন্য কোন ফাঁক রাখবে না। হাদীসের এসব শব্দ দ্বারা প্রমাণিত হয় ঃ রাসুল (সঃ) কাতার সোজা করে দাঁড়ানোর নির্দেশ দেওয়ার পাশাপাশি দু'জনের পায়ের মধ্যখ-ানের কোন ফাঁক না রাখার ব্যাপারে ও যে, তার সাহাবীদের প্রতি নির্দেশ দিয়েছিলেন তা পরিষ্কার ফুটে উঠেছে। এই জন্য সাহাবীগণ পরস্পরের সাথে কাঁধে কাঁধ বরাবর করার পাশাপাশি পায়ের সাথে পা মিলিয়ে দাঁড়াতেন। আর সেগুলি রাসুল (সঃ) এর সামনে করতেন। রাসুল (সঃ) ও যে সেগুলি প্রত্যক্ষ করতেন তার প্রমাণ ঃ সাহাবীগণ বলতেন* اقبل علينا*। ঐ সময় রাসুল (সঃ) আম-াদের দিকে ফিরে দাড়াতেন এবং ঐ নির্দেশ গুলি দিতেন। (বোখারী) কিন্তু মুফতী ওয়াক্কাস আলী সাহেব তো হানাফী মাযহাবের নীল চশ্মা পরে হাদীস দেখেন! এই জন্য হাদীসের এ সকল শব্দ যেমন উপরে দেখুন, কাঁধ বরাবর কর, দু'জনের মধ্য খানের ফাঁক বন্ধ কর, শয়তানের জন্য মধ্যখ-ানে ফাঁক রেখ না ইত্যাদি খুঁজে পান না। এই জন্য তিনি মাযহাবীয় গন্ডির নিশ্ছিদ্র ঘেরাটোপের মধ্যে পা রেখে বলেছেন- পায়ের সঙ্গে পা মিলান এটা রাসুল (সঃ) এর কথা নয় এটা শুধু দু একজন সাহাবীর ব্যক্তিগত আমল।*

তারপর হস্তদয়ের তালু কেবলা মুখী করে আঙ্গুল গুলি খোলা ভাবে রেখে কাঁধ (বোখারী) কান (মুসলিম) পর্যন্ত উঠিয়ে আল্লাহু আকবার বলে নামায আরম্ভ করতেন এটাই সুন্নতি পদ্ধতি। (বোখারী, মুসলিম)। জায়নামাযে দাঁড়িয়ে কোন কিছু দোয়া

পড়ার কথা হাদীসে নেই। তাই ওটা বিশ্ব নবী (সঃ) এর পদ্ধতি নয়।১৭

১৭ আমাদের দেশে প্রচলিত মাযহাবী নামাযে জায়নামাযের দোয়া হিসাবে ...... انى وجهت (الخ) ইন্নি ওয়াজ্জাহাতু (শেষ পর্যন্ত) পড়া হয় এ ধরণের কোন দোয়া যে জায়নামাযে দাঁড়িয়ে পড়তে হয়, তা হাদীসের পাতায় খুঁজে পাওয়া যায় না।এটা কোরআনের একটা আয়াত এটা এখানে পড়তে হবে তার কোন প্রমাণ নাই। এটা একটা অবিকৃত নিয়ম। এটা বেদাত। সমাজে এটা প্রচলন আছে বলে নামধারী মুফতী সাহেবরা এর বিরুদ্ধে মুখ খোলেন না। না জানি কোন বড় মিয়া আবার অখুশি হয়ে যায় না কি।
তাই বলছি ঃ যে পদ্ধতির কথা হাদীসে পাওয়া যায় না সেটাতো নিজেদেরই তৈরী করা পদ্ধতি। এহেন পদ্ধতি যদি নামাযের মত শ্রেষ্ঠ ইবাদাতের শুরুতেই থাকে তা হলে তার অবস্থা কি হবে ভেবে দেখুন। আর এটাকে বিশ্ব নবী (সঃ) এর পদ্ধতি বলে চালিয়ে দেওয়া সরল প্রাণ মানুষদের কে শুধুমাত্র ধোকাই দেওয়া বই কিছুই না আল্লাহ সবাইকে এহেন ধোকার হাত হতে মুক্ত করুন. আমীন।

নামাযের নিয়ত

আরবীয় ভাষায় নিয়ত অর্থ সংকল্প। আল্লামা ইবনে হযার আসকালানী (রহঃ) ফতহুল বারীর ভিতরে লিখেছেন, আল্লাহর সন্তুষ্টি সাধন মানসে তাঁর মনোনীত কার্য্য সম্পাদন মনস্ত করাকে শরীয়তের পরি ভাষায় নিয়্যত বলে।
তাহলে নিয়্যত অর্থ যখন মনের সংকল্প তখন তো তা মুখে উচ্চারণের ব্যাপার নয়। নামাযের জন্য দাঁড়িয়ে কি নামায, ফরয না সুন্নাত, অথবা নফল, একাকী কিংবা জামাতে, ইমাম কিংবা মুক্তাদী, ইত্যাদি শুধু মনে মনে সংকল্প করতে হবে মাত্র, তার জন্য কোন গদ বা ইবারাত পড়তে হবে না।
হানাফী মাযহারের প্রচলিত নিয়ত পড়ার নিয়মটি দ্বীনের ভিতরে নতুন সৃষ্টি তথা বেদাত। তাই বিশ্বনবী (সঃ) এর নামাযের মধ্যে এর কোন স্থান নেই। নামধারী কিছু মুফতী সাহেবরাও জানতঃ এ বেদাতের প্রশ্রয় দিয়েছেন। এর বিরুদ্ধে কোন দিন মুখ খোলেননি। তবে হানাফী মাযহাবের যারা পূর্বেকার পন্ডিত ছিলেন তারা কিন্তু এটাকে বেদাত বলেছেন– তাই আল্লামা আব্দুল হাই লাখনভী (রাঃ) বলেন, মুখে নিয়্যত পাঠ করা বেদাত।(দেখুন সিরাতুল মুস্তাকিম)। এ ব্যাপারে হানাফী মাযহাবের আর একজন পন্ডিত আল্লামা আঃ হক্ক মুহাদ্দীস দেহলভী (রহ) বলেন, রাসুল (সঃ) যখন নামায পড়তে দাঁড়াতেন তখন শুধু বলতেন- আল্লাহু আকবার এর পূর্বে মুখে নিয়্যাত পড়ার কোন শব্দ হাদীসে বর্ণিত হয়নি। সেই কারণে মুহাদ্দীসগণ মুখে নিয়ত বলা এবং পড়াকে **বেদাত** বলেছেন। (দেখুন- মাদারেসুন নবুয়াহ)। এরপর মোল্লা আলী কারী হানাফী **(রহঃ) বলেন**, আল্লাহর নবী (সঃ) ৩০ হাজার নামায আদায় করেছেন তথাপি তাঁর থেকে এ কথা বর্ণিত নেই যে, আমি উমুক উমুক নামাযের নিয়্যত

করছি। (দেখুন- মেরকাত ১মঃ ৩৭ পৃঃ)।
হানাফী মাযহারের কোন ফেকাহর কেতাবেও মুখে নিয়্যত করার কোন শব্দ খুঁজে পাওয়া যায় না।
অতএব, মুখে নিয়্যাত পড়া বিশ্বনবী (সঃ) এর পদ্ধতি নয়, বরং বেদাত। আল্লাহ আমাদের সব ভাইকে এহেন বেদাত থেকে রক্ষা করুন। আমীন।

নামায কিভাবে শুরু করতে হয়

রাসুল (সঃ) যখন নামাযে দাঁড়াতেন তখন কেবলার দিকে মুখ করতেন এবং দুই হাত উঠাতেন এবং বলতেন আল্লাহু আকবার।(বোখারী, মসুলিম, মেশকাত ৬৭ পৃঃ)। রাসুল (সঃ) আবু হুরায়রা (রা) কে কেবলার দিকে মুখ করে আল্লাহু আকবার শব্দ দিয়ে নামায শুরু করতে বলেছেন। (সেহা সেত্তা বুলুগুল মারাম ১৯ পৃষ্ঠা)।
আল্লাহ আকবার বলে নামায শুরু করাকে তাকবীরে তাহরিমা বলে। রাসুল (সঃ) মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তাকবীরে তাহরিমার সময় আল্লাহু আকবার শব্দ ছাড়া অন্য কিছুই বলেননি। (যাদুল মায়াদ ১মঃ ৫১ পৃঃ)।
কোন ব্যক্তি যদি আল্লাহু আকবার না বলে আল্লাহর নিরা নব্বইটি নামের মধ্যে কোন একটি নাম দ্বারা নামায শুরু করে তাহলেও তার নামায হবে না। (তিরমিযী ১ম ৩৩ পৃষ্ঠা)। আর এটাই হচ্ছে জমহুরে মুহাদেসীনের মাসলা। নামায শুরু করার এ পদ্ধতি মহিলা পুরুষ উভয়ের জন্য একই। (বোখারী, মুসলিম) ১৮

১৮ প্রচলিত মাযহাবী নামাযে আছে কোন মুসল্লী যদি নামায শুরু করার সময় আল্লাহু আকবার না বলে যদি আল্লাহু আযাম, আররাহমানু আকবার অথবা ফারসিতে আল্লাহ বুজর্গাস্ত বলে হাত বাঁধে তা হলে নাকি তার নামায শুদ্ধ হবে। (দেখুন ফেকাহ হেদায়া ১মঃ ৮৪ পৃষ্ঠা)।
আর হাত উঠানোর ব্যাপারে মাযহাবী কেতাবে মেয়ে পুরুষের পার্থক্য করে ফেলেছেন। মেয়েরা সিনা পর্যন্ত হাত তুলবে (কাবিরী ২৯৩ পৃঃ) আর কৃতদাসরা পুরুষের মত কাধ বা কান পর্যন্ত। (তাহাবী ১৫২ পৃষ্ঠা)। এর প্রমাণে কোন হাদীস না পেয়ে আল্লামা হালাবী হানাফী নিজের মাযহাব রক্ষা করার জন্য যুক্তির আশ্রয় নিয়ে বলেছেন, সিনা পর্যন্ত হাত তোলাতে মেয়েদের জন্য নাকি অধিক পর্দা হয়।
আর বিশ্ব নবীর নামাযই হানাফী মাযহাবের নামায নামক বই এর লেখক ঐ একই সুরে সুর মিলিয়ে তার বই এর ১১৬ পৃষ্ঠার মধ্যে একটি মাওযু (বানাওয়াট) হাদীস পেশ করেছেন, মাজমাউজ যাওয়ায়েদ থেকে যে, রাসুল (সঃ) ওয়াইলবিন হুজুর (রাঃ) কে বলেছেন যে, তাকবীর তাহ্‌রিমার সময় পুরুষ কান পর্যন্ত ও মহিলারা স্তন বরাবর হাত উঠাবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় ঐ হাদীসের নিচে দেখুন লেখা আছে যে, যিনি হাদীসটি বর্ণনা করেছেন لم يعرفها- তাকে কেউই চেনে না। (দেখুন ঐ মাযমাউম যাওয়ায়েদ ১১৬ পৃষ্ঠা)। এই হচ্ছে বিশ্বনবী (সঃ) এর নামাযই হানাফী মাযহারের নামায নামক বই এর দলিলের অবস্থা। আল্লাহ আমাদের সব ভাইকে প্রকৃত বিশ্বনবী (সঃ) এর অনুসারী হওয়ার তাওফীক দিন। আমীন।

নামাযে হাত বাধা

সহীহ হাদীস অনুযায়ী হাত বুকের উপরে বেঁধে নামায পড়তে হয়।

প্রথম দলিল ঃ-

عن سهل بن سعد كان الناس يومرون ان يضع رجل اليده اليمنى على ذرائه اليسرى فى الصلاة

অর্থাৎ ঃ- সাহাল বিন সা'আদ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন (রাসুল (সঃ) এর যুগে) লোকেরা ডান হাত বাম হাতের "যেরার উপর রাখতে আদিষ্ট হতেন,(বোখারী ১০২ পৃষ্ঠা)।

সকল হাদীস অভিধান ও তাফসিরের কেতাবে যেরার অর্থ হাতের কনুই হতে মাধ্যমিক আঙ্গুলের মাথা পর্যন্ত লেখা হয়েছে। তাহলে বোঝা গেল হাতের কনুই হতে আঙ্গুলের মাথা পর্যন্ত সোজা পিঠকে যেমন গজ হাত বলে তেমন হাতের কনুই হতে আঙ্গুলের মাথা পর্যন্ত হাতের অপর পিঠের অংশকে হাদীসে অভিধানে ও তাফসিরের কেতাবে যেরাউন বলা হয়েছে। সুতরাং ডান গজ হাত বাম গজ হাতের যেরার উপর রাখলে হাত যে বুকের উপর থাকে তা অতি সাধারণ লোককেও মনে হয় আর বুঝিয়ে বলার দরকার হয় না।

দ্বিতীয় দলিল ঃ-

عن وائل بن حجر (رض) قال صليت مع النبى ﷺ فوضع يده اليمنى على يده اليسرِى على صدره

অর্থাৎ ঃ- ওয়াইল বিন হুজর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন- আমি রাসুল (সঃ) এর সঙ্গে নামায পড়েছি। তিনি তার ডান হাত বাম হাতের উপর রেখে সিনার উপরে রাখলেন।(সহীহ ইবনে খুযায়মা , আবু দাউদ মারাসিল ৬ পৃষ্ঠা)।

রাসুল (সঃ) নামাযে হাত খাস করে সিনার উপরে রাখার সহীহ হাদীস খানা আরও যেসব হাদীসের গ্রন্থে পাওয়া যাবে।(বুলুগুল মারাম ২০ পৃষ্ঠা মুসলিম শরাহ নববী ১মঃ ১৭৩ পৃষ্ঠা, তোহফা শরাহ তিরমিযী ১মঃ ২১ পৃষ্ঠা। মিসখুল খেতাম ১মঃ ২১৫ পৃষ্ঠা। তাফসিরে কবীর ৮ম; ৬৪৫ পৃষ্ঠা। ইত্যাদি।

তৃতীয় দলিল—

عن وائل بن حجر (رض) اخبره قال قلت لا نظرن الى صلاة رسول الله ﷺ كيف يصلى فنظرت اليه فقام

نكبر ورفع يديه حتى جاذتا باذنيه ثم وضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد..... (الخ)

অর্থাৎ ঃ- ওয়াইল বিন হুযর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মনে মনে বললাম, নিশ্চয় আমি রাসুল (সঃ) এর নামায দেখব যে তিনি কেমন ভাবে নামায আদায় করেন। তারপর আমি দেখলাম তিনি নামাযে দাঁড়িয়ে তাকবীরে তাহরিমা বললেন, এবং তার দুই হাত উভয় কান পর্যন্ত উঁচু করলেন, এবং তার ডান গজ হাত বাম গজ হাতের পাঞ্জা, কব্জি ও সায়েদ এই তিনটির উপরে রাখলেন। (আবু দাউদ, নাসাঈ)। নামাযে রাসুল (সঃ) এর এ হাত বাধাঁর দৃশ্য হযরত ওয়ায়েল বিন হুজুর স্বচক্ষে দেখেছেন। (হাদীস অভিধান তাফসিরের কেতাবে হাতের কব্জি হতে কনুই পর্যন্ত অংশকে সায়েদ বলে)।

পাঠকগণ, ডান হাত বাম হাতের তালু কব্জি ও সায়েদের ওপর রাখলে হাত যে বুকের উপর থাকে তা আর মনে হয় কাউকে বুঝিয়ে বলার দরকার হয় না।

নামাযে বুকের উপর হাত বাধাঁর হাদীস যে সব-হাদীস গ্রন্থে এসেছে— মুয়াত্তা মালেক, মুসলিম, বায়হাকী, ফতহুল গফুর, ইবনে আবি হাতেম, সুবুলুস সালাম, ইবনে আবি শায়বা, সহীহ ইবনে হিব্বান, মুসনাদে আহমাদ, ইত্যাদি। রাসুল (সঃ) এর সহীহ হাদীস অনুযায়ী মক্কা মদিনাসহ সকল আহলে হাদীসগণ নামাযে বুকের উপর হাত বেঁধে নামায পড়ে থাকেন।

এরপর মহামান্য ইমাম চতুষ্টয়ের মধ্যে ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের অনুশারীগণ সহীহ হাদীস অনুযায়ী বুকের উপর হাত বেঁধে নামায পড়ে থাকেন। অনুরূপ ভাবে হানাফী মাযহাবের মহিলাগণ ও বুকের উপর হাত বেঁধে নামায পড়ে খাকেন। ১৯

১৯ প্রচলিত হানাফী মাযহাবের পুরুষগণ নাভির নিচে হাত বেঁধে নামায পড়ার প্রচলন আছে, তাই বিশ্বনবী (সঃ) এর নামাযই হানাফী মাযহাবের নামায নামক বই এর লেখক তার স্বপক্ষে কিছু দলিল আনতে যেয়ে খুব সম্ভব প্রথমে চিন্তা করেছেন যে, সকল দলিল গুলি যদি ৪র্থ ৫ম অথবা ৬ষ্ঠ স্তরের কেতাব থেকে দেই তাহলে এ বই লোকের কাছে গ্রহনযোগ্য হবে কেন? তাই দু'একটি দলিল প্রথম স্তর অর্থাৎ বোখারী মুসলিমের হাদীস হতে তৈরী করে দেখান দরকার সেজন্য ***প্রথম দলিল*** *হিসাবে এনেছেন বোখারী হতে সাআদ বিন সাহাল এর বুকে হাত বাধার হাদীস খানা। উপরে বুকে হাত বাঁধা আমার প্রথম দলিলটি দেখুন কত স্পষ্ট কথা। ঐ হাদীসটির যেরাউন শব্দটি নিয়ে কতই না তাল বাহানা করেছেন। কোন সময় "যেরাউন" শব্দের অর্থ হাতের তালু, কোন সময় হাত, কোন সময় বাহু, কোন সময় হাতের কনুই হতে আঙ্গুলে মাথা পর্যন্ত। অর্থাৎ রাসুল (সঃ) এর ঐ বুকের ওপর হাত বাঁধার হাদীসটি কিছু শব্দের বিকৃত অর্থ করে হাত নাভির একে বারে নিচে নিয়ে যাওয়ার অপচেষ্টা করেছেন। অথচ ওটা কখনও নাভির নিচে হাত বাঁধার দলিল নয়, তার জলন্ত প্রমাণ হলো আজ পর্যন্ত কোন হানাফী পন্ডিত এই হাদীসটিকে নাভির নিচে হাত বাঁধার দলিলরূপে পেশ করার নির্বুদ্ধিতা দেখায়নি।*

পাঠকগণ, হাদীসের সরল সহজ অর্থ কে কিভাবে বিকৃত অর্থ করে ঘুরিয়ে মাযহাবী মাসলার পক্ষে আনতে হয় সে বিষয়ে তারা অল স্কয়ার মুফতী।

মুফতী সাহেব নাভির নিচে হাত বাধার আরও একটি হাদীস বোখারী শরীফ থেকে তৈরি করার নির্বোধ ও হাস্যকর চেষ্টা চালিয়েছেন ***দ্বিতীয় দলিল*** *হিসাবে । সেটা হচ্ছে ইমাম বোখারী (রহঃ) বোখারী শরীফের ১ম খঃ ১৫৯ পৃষ্ঠায় একটি অনুচ্ছেদ এভাবে বেঁধেছেন- যে -*

باب استعانة اليد فى الصلاة--------(الخ)

অর্থাৎ নামাযরত অবস্থায় হাতের সাহায্য নেওয়া। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন কোন ব্যক্তি নামাযের মধ্যে তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দিয়ে সাহায্য নিতে পারে। আবু ইসহাক নামাযের মধ্যে তার টুপি নামিয়ে আবার মাথায় উঠিয়ে ছিলেন। হযরত আলী (রা) তাঁর ডান হাতের তালু শরীর চুলকানোর জন্য বা কাপড় ঠিক রাখার জন্য বাম হাতের কব্জির উপরে আনতেন। ইমাম বোখারী (রহঃ) এর উক্ত অনুচ্ছেদে প্রশ্ন হচ্ছে হযরত আলী (রাঃ) নামাযরত অবস্থায় শরীর চুলকানোর জন্য যদি তাঁর ডান হাতের তালু বাম হাতের কব্জির উপর এনে থাকেন তাহলে তাঁর হাত নামায শুরু করার সময় ও শরীর চুনকানোর আগে কোথায় ছিল? তার হাত ছিল বুকের উপর। হযরত আলী বুকের উপর হাত বেঁধে নামায পড়তেন তার প্রমাণ। দেখুন তফসীরে খাযেন ৭মঃ ২৫৪ পৃঃ ।তাফসিরে কাবীর ৮ম ৫০২। । তারপর না তিনি তা করলেন। আপনিও বুকের উপর হাত বেঁধে শরীর চুলকানোর জন্য ডান হাতের তালু বাম হাতের কব্জির উপর নামাযরত অবস্থায় আনতে পারেন। এটা নামাযরত অবস্থায় জায়েয আছে। কিন্তু মুফতী সাহেব বলছিলাম! চুলকানোর জায়গা তো শুধু নাভির নিচে নয়? নাভির উপরেও তো চুলকাতে পারেন। তাই ডান হাতের তালু যখন বাম হাতের কব্জির উপর নামাযরত অবস্থায় আনা যায়, তখন হাত তো নাভির নিচে অবশ্যই নিয়ে যাওয়া যাবে; সেখানেও আপনি চুলকাতে পারেন চুলকান। তবে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে নামাযে নাভির নিচে হাত বাঁধার দলিল বোখারীতে আছে বলে সরলপ্রাণ মানুষদেরকে বৃথা ধোকা দিয়ে কিন্তু পার পাবেন না।

এরপর তিনি আর একটি দলিল আবু দাউদ হতে আবিষ্কার করার চেষ্টা চালিয়েছেন। সেটাও নামাযে বুকের উপর হাত বাঁধার হাদীস। দেখুন আমার বুকে হাত বাঁধার তৃতীয় নং দলিল। সেখানে দেখুন--ওয়াইল বিন হুজর (রাঃ) স্বচক্ষে দেখেছেন, রাসুল (সঃ) নামাযে তাঁর ডান হাত বাম হাতের কাফ, (তালু) রোসগ (কব্জি); সায়েদ (কনুই হতে মধ্যমা আঙ্গুলের মাথা পর্যন্ত) এই তিনটির উপরে রাখলেন। অথচ উনি কিভাবে শব্দের বিকৃত অর্থ করে হাদীসটি নিজের পক্ষে এনেছেন। এবার লক্ষ্য করুন, হাদীসটির ইবারাত এভাবে এসেছে।

ووضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد

অর্থাৎ - তিনি তার ডান হাত বাম হাতের তালু, কব্জি ও সায়েদ এই তিনটির উপর রাখলেন। উনি অর্থ করেছেন ডান হাতের কব্জি বামহাতের কব্জির উপরে রাখলেন। এ ভাবে উনি হাদীসের শাব্দিক অর্থকে বিকৃত করে দেখাতে চাচ্ছেন যে, হানাফী মাযহারের নামাযের পদ্ধতি হচ্ছে সহীহ হাদীস ভিত্তিক ও বিশ্বনবী (সঃ) এর নামাজের পদ্ধত্তি।

পাঠকগণ হাদীসের শাব্দীক অর্থ ঠিক রেখে ডান হাত যদি বাম হাতের পাঞ্জা কব্জি ও পুরা সায়েদ এর উপরে রাখা হয় তাহলে জীবনেও হাত নাভির নিচে (মাজা কুড়ান ছাড়া) নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। তিনি তেবে ছিলেন এটা কেউ বুঝতে বা ধরতে পারবে না। এরপর তিনি ইবনে আবি শায়বা থেকে দুটি আসার এনেছেন যা একেবারে বানাওয়াট। তারপর শেষে আবার আবি শায়বা থেকে হযরত আলী (রাঃ) এর উদ্বৃতি দিয়ে আর একটি দলিল এনেছেন যে, হযরত আলী (রাঃ) বলেছেন নাড়ির নীচে হাতবাঁধা সুন্নাত।

পাঠকগণ হযরত আলী (রা) এর এই উক্তিটি এটা হযরত আলী (রা) এর উক্তি নয় এটা বর্ণনাকারী

আবু শায়বার মত একজন মিথুক্যের বানানো কথা আর আবু শায়বা কে যিনি মিথ্যুক বলেছেন তিনি স্বয়ং ইমাম আবু হানিফা। (দেখুন- হেদায়া-১২০ পৃষ্ঠা)।

হানাফী মাযহাবের প্রখ্যাত পন্ডিত আল্লামা হায়াত সিন্দী (রহঃ) এই হাদীসের আসল কথাটা ফাঁস করে দিয়েছেন এভাবে তিনি লিখেছেন- تحت سر *(তাহাতাস সুররাহ) নাভির নীচে এ কথাটি আবি শায়বার মূল গ্রন্থে নেই। (দেখুন ফতহুল গফুর) । তাহলে নিশ্চয় কথাটি বানোয়াট ? পাঠকগণ এই হচ্ছে বিশ্বনবী (সঃ) এর নামাযই হানাফী মাযহারের নামায নামক বই এর দলিল প্রমানের মিথ্যচ-ারের কিছু নমুনা।*

এবার আসুন মুফতীসাহেব নাভির নীচে হাত বাঁধার হাদীস যে সহীহ নয় এবং বুকের উপর হাত বাঁধার হাদীস যে সহীহ তার প্রমাণ আপনাদের ফেকাহ কেতাব থেকে নিন।

নাভির নীচে হাত বাধার হাদীস দুর্বল এবং ওয়ায়েলবিন হুযুরের বর্নিত বুকে হাত বাঁধার হাদীসের মোকাবেলায় মরদুদ। (দেখুন ফেকাহ হেদায়া ৮৬ পৃষ্ঠার হাসিয়া। এবং দেরায়া ১২০ পৃষ্ঠা)। নাভির নীচে হাত বাধার হাদীস যঈফ এবং যঈফ হওয়াতে সকল হাদীসের ইমামগণ একমত। (দেখুন হেদায়া ১ম খঃ ৮৬ পৃষ্ঠা)। বুকে সিনার উপর হাত বাঁধার হাদীস সহীহ। (দেখুন - নূরুল হেদায়া ৯৩ পৃষ্ঠা)। আল্লাহ সকল কে সহীহ হাদীসের উপর আমল করার তৌফিক দিন -আমীন।

নামাযে সানাপাঠ করা

সানা অর্থ প্রশংসা। এটা হচ্ছে দোয়ায়ে ইসতেফতাহ বা নামায শুরুর দোয়া। বুকে হাত বেঁধে সেজদার স্থানে দৃষ্টি রেখে (বায়হাকী, মেশকাত ৯১ পৃষ্ঠা)। বিনয় সহকারে নিম্নের দোয়াটির মাধ্যমে মুসলিমরা তার সর্বোত্তম ইবাদাতের শুভ সূচনা করবে।

اللهم باعد بينى وبين خطاياي كما باعدت بين المشرك والمغرب اللهم نقنى من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس - اللهم اغسل خطاياى بالماء والثلج والبرد

আল্লাহুম্মা বা ঈদ বাইনী অয়া বাইনা খাত্বা ইয়া ইয়া কামা বা--আত্তা বাহনাল মাশরিকি অয়াল মাগরিব। আল্লাহুমা নাক্কিনী মিনাল খাতাইয়া কামা ইউনাক্কাস ছাত্তবুল আব ইয়াযু মিনাদ দানাস। আল্লাহুম মাগসিল খাত্বা ইয়া ইয়া বিল মা-য়ি অয়াস ছালজি অয়াল বারাদ।

হে আল্লাহ তুমি আমার ও আমার গোনাহ সমূহের মধ্যে ততটা দুরত্ব সৃষ্টি করে দাও যতটা দুরত্ব তুমি পূর্ব পশ্চিমের মধ্যে করে রেখেছ। হে আল্লাহ তুমি আ-মাকে পাপরাশি থেকে ঐ রূপ পাক সাফ করে দাও যেমন সাদা কাপড় ময়লা থেকে সাফ হয়। হে আল্লাহ তুমি আমার পাপ গুলি পানি দিয়ে বরফ দিয়ে ও শিলাবৃষ্টি দিয়ে ধুয়ে দাও। (বোখারী, মুসলিম)।

এই সানা ব্যতীত হাদীসে আরও কয়েকটি সানা পাওয়া যায় তবে সব চেয়ে বিশুদ্ধ সানা এটাই। জমহুরে মুহাদ্দেসিনও বোখারীর বর্ণিত সানাটির পক্ষে। বোখারীর বর্ণিত সানাটি বহু সাহাবী কর্তৃক বর্ণিত মুতাওয়াতির হাদীস। এই সানাটি রাসুল (সঃ) নামাযে পড়তেন। (বোখারী,. মুসলিম)। যুগ শ্রেষ্ঠ মহাদ্দিস আল্লামা নাসির উদ্দিন আলবানী (রহঃ) তাঁর সেফাতুস সারাতুন্নবী গ্রন্থে সর্ব প্রথমে এই সানাটি এনেছেন, সর্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ বলে। ২০

২০ বিশ্বনবী (সঃ) এর নামাযই হানাফী মাযহাবের নামায নামক বই এর লেখক নামাযে সানা পাঠ করার অনুচ্ছেদে- আবু দাউদ, দারা কুতনীর উদ্বৃতি দিয়ে যে সানাটির কথা উল্লেখ করেছেন (সুবহানাকা আল্লাহুম্মা-শেষ পর্যন্ত-) তা হচ্ছে হাদীসের কেতাব সমূহের মধ্যে বর্ণিত সানা গুলির মাঝে সবচেয়ে দুর্বল সূত্রে বর্ণিত ও গায়ের সহীহ। ইমাম আবু দাউদ হাদীসটি বর্ননা করার পর হাদীসটি আপত্তিকর বলে উল্লেখ করেছেন। (দেখুন আবু দাউদ ১মঃ ১১৩ পৃষ্ঠা।) ইমাম তিরমিযী হাদীসটি আনার পর বলেছেন- لايصح هذا الحديث এই হাদীসটি সহীহ নয় (দেখুন তিরমিযী ১মঃ ৩৮ পৃষ্ঠা)। এরপর লেখক দারাকুতনীর উদ্ধৃতি দিয়ে সানাটি আনার পর লিখেছেন- রেজাল শাস্ত্রের মানদন্ডে হাদীসটি সহীহ। এটা মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে কথাটি বলা হয়েছে কারণ ঐ দারা কুতনীতেই দেখুন লেখা হয়েছে- اسناده ضعيف হাদীসটির সনদ যঈফ। (দারাকতুনী ১মঃ হ ২৩৭ পৃষ্ঠা।) অতএব এ হাদীস যখন সহীহ সুত্রে বর্ণিত হয়নি তখন সহীহ সূত্রে বর্ণিত সানা থাকতে এটাকে বিশ্বনবী (সঃ) এর নামাযের পদ্ধতি বলে চালিয়ে দেওয়া শুধু মানুষদের প্রতারণা করা বই কিছুই না। কারণ বিশ্বনবীর পদ্ধতি হতে হলে সেটা অবশ্যই বিশ্বনবীর সহীহ হাদীস অনুযাই হতে হয়।

<u>এবার দেখুন আপনাদের মাযহাবের বরেণ্য ফেকাহ ফতহুল কাদীরের ভিতরে এ সম্পর্কে লেখা হয়েছে।</u> (সুবহা-নাকাআল্লাহুম্মা-----) এই সানাটি ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম তিরমিযী তাদের গ্রন্থে আনার পর হাদীসটি যঈফ বলেছেন। আর আল্লাহুম্মা বাঈদ বাইনী সানাটি সব চেয়ে সহীহ। (দেখুন- আপনাদেরই ফেকাহ ফতহুল কাদীর ইবনে হুম্মাম ১মঃ ১১৮ পৃষ্ঠা)। আল্লাহ সকলকে সহীহ হাদীসের ওপর আমল কারী হয়ে বিশ্ব নবী সঃ এর প্রকৃত অনুসারী হওয়ার তৌফিক দিন - আমীন।

নামাযে আউজু বিল্লাহ ও বিস্‌মিল্লাহ পাঠ

সানা পাটের পর আউজুবিল্লাহ এভাবে পাঠ করবে-

اعوذ بالله السمع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه

আউজু বিল্লাহিস্ সামিয়িল আলিমিনাশ্ শায়তানির রযিম মিন হামযিহী অয়া নাফখিহী অয়া নফ্সিহি অর্থাৎ - আমি বিতাড়িত শয়তানের খোচা কুমন্ত্রণা ও প্ররোচনা হতে সর্ব শ্রোতা আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাচ্ছি। (আবু দাউদ, তিরমিযী ১মঃ ৩৩ পৃষ্ঠা)।

এরপর বিস্‌মিল্লাহির পাঠ করতে হবে بسم الله الرحمن الرحيم বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। পরম করুণাময় আল্লাহর নামে আরম্ভ করিতেছি। (ইবনে কাছির ও দারা কুতনী)। প্রত্যেক নামাযে এবং প্রত্যেক রাকাতে সুরা ফাতেহার আগেও অন্য সুরা পড়ার আগে বিস্‌মিল্লাহ অবশ্যই পড়তে

হবে; কারণ রাসুল (সঃ) আবু হুরায়রা (রাঃ) কে বলেছেন যখন তোমরা সূরা ফাতেহা পড়বে তখন বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম পড়বে কারণ ওটা ওর একটি আয়াত। (দারাকুতনী, বুলুগুল মারাম ২১ পৃষ্ঠা)। বিস্‌মিল্লাহ কখনও জোরে কখনও আস্তে দু'রক,মই পড়া হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। যারা বলেন- বিস্‌মিল্লাহ জোরে পড়ার কোন দলিল নেই তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। মা আয়শা (রাঃ) বলেন- রাসুল (সঃ) বিসলিল্লাহ পড়লেন সূরা ফাতিহার আগে এবং ওটাকে আয়াত বলে গণ্য করলেন। একদা আবু হুরায়রা (রা) নামায পড়াকালে প্রথমে বিস্‌মিল্লাহ পড়লেন তারপর সূরা ফাতেহা পড়লেন। অতঃপর নামায শেষে বললেন যার হাতে আমার জান আছে তাঁর কসম, আমি তোমাদের মধ্যে রাসুল (সঃ) এর নামাযের সব চেয়ে বেশি সাদৃশ্য পেশকারী। (সহীহ ইবনে খুযায়মা ও সহীহ ইবনে হিব্বান বুলুগুল মারাম ১০ পৃষ্ঠা)।

আব্দুর রহমান আবজী বলেন, আমি হযরত ওমর (রাঃ) এর পিছনে নামায পড়ি তিনি বিস্‌মিল্লাহ জোরে পড়লেন।(ইবেন আবি সায়েবা , ত্বহাবী, বায়হাকী, ২য় খন্ড, ৪৮ পৃঃ)। এ আসারে হাদীসটির বর্ণনাকারীগণ সবাই রেজালের মান মন্ডে বিশ্বস্ত। (দেখুন তাকরীবুত তাহ্‌জীব)।এবং সনদ মুক্তাসিল।

একদা মুয়াবিয়া (রাঃ) মদিনায় নামায আদায় করতে গিয়ে বিস্‌মিল্লাহ জোরে না পড়ায় উপস্থিত সাহাবা বৃন্দ উক্ত কাজের বিরুদ্ধেও জোরে পড়ার পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করলেন। ফলে তিনি নামায আবার পুনরায় বিসমিল্লাহ সহ আদায় করলেন। (তফসিরে ইবনে কাছির ও মুস্তাদ রাকে হাকীম)।

এর উপর ভিত্তি করে যে সব নামাযে সুরা কেরাত জোরে পড়তে হয় সে সব নামাযে অনেকে বিস্‌মিল্লাহ ও জোরে পড়ে থাকেন। এর উপর শাফেয়ী মাযহারের আমলও রয়েছে। কিন্তু বিশ্বনবী (সঃ) এর নামাযই হানাফী মাযহারের নামায নামক বই এর লেখক লিখেছেন, নামায়ে উচ্চ স্বরে বিসমিল্লাহ পাঠ বেদাত। কিন্তু এর প্রমাণ দিতে ব্যর্থ হয়ে তা গোপন করেছেন। এ মসলায় শাফেয়ী মাযহারের আমল থাকা সত্ত্বেও বেদাত বললেন আল্লাহর রাসুল (সঃ) বলেন-

كل بدعة ضلال وكل ضلالة فى النار

অর্থাৎ প্রত্যেক বেদাত গোমরাহী আর প্রত্যেক গোমরাহীর ঠিকানা জাহান্নাম। (মেশকাত) । আর উনি বলে বেড়ান ৪ মাযহাব হক্কের উপর আছে। তাই বলছিলাম এদেশে কোন শাফেয়ী মালেকী, হাম্বলী নেই, নইলে বিশ্বনবী (সঃ) এর নামাযই হানাফী মাযহাবের নামায নামক বই এর জবাব দেখতেন কত কঠিন ভাবে তাকে নিতে হত।

নামাযে সূরা ফাতেহা পাঠ

আউযু ও বিসমিল্লাহ পাঠের পর সূরা ফাতেহা পাঠ করতে হবে। রাসুল (সঃ) বিসমিল্লাহ পাঠের পর সুরা ফাতেহা পড়তেন। তিনি বলেছেন-

لا صلاة لمن لم يقرئ بفاتحة الكتاب

সূরা ফাতেহা ছাড়া কারুর কোন নামায হয় না। (বোখারী, মুসলিম)। তিনি (সঃ) এও বলেছেন- সুরা ফাতেহার এক নাম নামায যেমন হজ্জের এক নাম আরাফাত। অর্থাৎ আরাফাতে অবস্থান ব্যতীত হজ্জ হয় না বলে হজ্জকে আরাফাত বলেছেন। তদ্রুপ সূরা ফাতেহা ছাড়া কারুর কোন নামায হয় না বলে সুরা ফাতেহা কে নামায বলা হয়েছে। তিনি এও বলেছেন বান্দা যখন নামাযে সুরা ফাতেহার আয়াত গুলো পাঠ করে তখন আল্লাহ প্রতিটি আয়াতের পিছনে জওয়াব দেন।(মুসলিম মেশকাত ৭৮ পৃষ্ঠা)। এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় সূরা ফাতেহার প্রতিটি আয়াত থেমে থেমে পড়তে হয়। যারা থেমে থেমে না পড়ে একটানে বা ২/৩ টানে শেষ করে তারা সুন্নাতের বিরোধিতা করে। ফলে তাদের প্রতি আল্লাহ ও তার রাসুল (সঃ) এর অসন্তুষ্টি আশংকা করা যেতে পারে।

সূরা ফাতিহা পাঠের নিয়ম

রাসুলুল্লাহ (সঃ) সূরা ফাতেহার প্রতিটি আয়াত পৃথক পৃথক করে পাঠ করতেন। যেমনঃ- بسم الله الرحمن الرحيم তারপর থামতেন, আবার পড়তেন الحمد لله رب العالمين তারপর থামতেন, আবার পড়তেন الرحمن الرحيم- তারপর থামতেন আবার পড়তেন مالك يوم الدين এভাবে থেমে থেমে পাঠ করতেন-

اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين- امين

উচ্চারণ ঃ বিসমিল্লাহির রাহ্মা-নির রাহীম (১) আল হাম্দুলিল্লা-হি রাব্বিল আ-লামীন-(২) আর্ রাহ্মা-নির রাহীম-(৩) মা-লিকি ইয়াউমিদ্দীন-(৪) ইয়্যা-কানা'বুদু ওয়া ইয়্যা কানাস্তায়ীন-(৫) ইহ্দিনাস্ সিরা-তাল্ মুস্তাকীম-(৬) সিরা-তাল্লাযীনা আন্ আম্তা আ'লাইহিম, গাইরিল মাগ্যূবি আ'লাইহিম, ওয়ালাযয়াল্লীন-(৭)। (আ-মীন)

অর্থ ঃ পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি- (১) যাবতীয় প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার যিনি বিশ্ব জগতের পালনকর্তা- (২) যিনি নিতান্ত মেহেরবান ও দয়ালু- (৩) যিনি বিচার দিনের মালিক-(৪) আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদাত করি এবং শুধুমাত্র তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি-(৫) আমাদের সরল সঠিক পথ দেখাও- (৬) সে সমস্ত লোকের পথ যাদেরকে তুমি নিয়ামত দান করেছ, তাদের পথ নয় যাদের উপর গজব নাযিল হয়েছে এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে- (৭) (হে আল্লাহ! কবুল করুন)।

সূরা ফাতেহার ব্যাপারে সেহা সিত্তাসহ বহু হাদীস গ্রন্থে অসংখ্য হাদীস বর্ণিত হয়েছে সূরা ফাতেহা ইমাম মুক্তাদী, মুনফারিদ, সবার জন্য পড়া ফরয। রাসূল (সঃ) সাহাবীদের মুখোমুখি হয়ে বলেছেন -

لاصلاة لمن لم يقرء بفاتحة الكتاب خلف الامام

অর্থাৎ ঃ যে ব্যক্তি ইমামের পিছনে সুরা ফাতেহা পড়বে না তার নামায হবে না। (কেতাবুল কেরাত, বায়হাকী ৪৭ পৃষ্ঠা)। সাহাবীদের মুখোমুখি হয়ে রাসুল (সঃ) আরও বলেছেন যে, আমার পিছনে তোমরা সুরা ফাতেহা ছাড়া অন্য কিছুই পড়বে না উক্ত হাদিসে ইমামের পিছনে দু এক জন সাহাবী যারা সূরা ফাতেহার পর অন্য কিছু পড়তেন তা সবই -لا تفعلوا অন্য কিছুই পড়বে না দারা অচল হয়ে গিয়েছে। এর পরে ও যদি কেউ অন্য কিছু পড়ে ফেলে তাহলে বলা হয়েছে জায়েজ আছে।(মসুলিম)। কিন্তু যে ব্যক্তি সুরা ফাতেহা পড়বে না তার নামাযই হবে না। (আবু দাউদ, তিরমিযী, আহমাদ ইবনে মাযা)। আর এ কথা যখন নবী (সঃ) বলছিলেন তখন নবী (সঃ) ছিলেন ইমাম ও সাহাবীগণ ছিলেন মুক্তাদী। আর তারা এমন নামায পড়ছিলেন যার কেরাত ছিল স্বরবে সে অবস্থাকে কেন্দ্র করে বিশ্বনবী (সঃ) এর এ ফয়সালা। এমন কি কোন ব্যক্তি যদি ইমামকে রুকুতে পায় তাহলে তার সে রাকাত হয় না, কারণ ইমামকে রুকুতে পাওয়া মুক্তাদীর থেকে নামাযের অভ্যন্তরীণ দুটি রোকন বা ফরয ছুটে গেছে কেয়াম এবং কেরাত। তাই ঐ রাকাত ইমাম সালাম ফিরানোর পরে পড়ে নিতে হবে। (যুয বোখারী)। এ ব্যাপারে আমার লেখা রুকু পেলে রাকাত হবে না নামক বইটির ভিতরে আমি বিস্তারিত তুলে ধরেছি বইটি এক নজরে দেখার অনুরোধ রইল।

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেন,-

اقرء خلف الامام بفاتحة الكتاب

অর্থাৎ ঃ ইমামের পিছনে সুরা ফাতেহা পড়। ইমাম বায়হাকী আসারে হাদীসটি আনার পর বলেছেন هذا اسناده صحيح لا غبر عليه এ হাদীস সহীহ এর উপর কোন ময়লা নেই। এব্যাপারে বিস্তারিত দেখুন আমার লেখা ইমামের পিছনে সুরা ফাতেহা পড়ার দলিল আকাশের নক্ষত্রের মত উজ্জল নামক বইটি সেখানে আমি ইমামের পিছনে সূরা ফাতেহা পড়ার ব্যাপারে প্রমান স্বরূপ দুই শত বারটি দলিল এনেছি।

সাহাবায়ে কেরামগণ ইমামের পিছনে সূরা ফাতেহা পড়তেন। (বায়হাকী ২য় ১৭০ পৃষ্ঠা)। ইমাম বোখারী বলেন- হাসান বসরী, সাঈদ বিন যুবায়ের, মায়মুনা বিন মেহরান, এবং অগণিত তাবেইন ও তাবেতাবেইন ইমামের পিছনে সুরা ফাতেহা পড়ার পক্ষে- সে নামায জোরের হোক অথবা আস্তের হোক। (দেখুন যুয বোখারী, তাওজিহুল কালাম ৫৩ পৃষ্ঠা)। কেউ কেউ বলে থাকেন ইমাম উচ্চস্বরে কেরাতে পড়লে তখন মুক্তাদী শুধু শুনলেই যথেষ্ট হবে। কিন্তু এ ব্যাপারে হযরত উবাদা (রা) এর স্বাক্ষ্য মওজুদ আছে যে-

لا يقرأ ن احدكم اذا جهرت بالقرا أة الا بفاتحة الكتاب

অর্থাৎ - রাসুল (সঃ) বলেছেন, আমি যখন যোরে কেরাত পড়ি তখন তোমরা সুরা ফাতেহা ছাড়া কিছুই পড়বে না। (নাসাঈ), হাদীস সহীহ।

এ কথার স্বাক্ষ্য যিনি দিয়েছেন, তিনি (উবাদা) ও ইমামের পিছনে সুরা ফাতেহা পড়তেন। (কেতাবুল কেরাত,বাইহাকী ২য় খন্ড ১৬৮ পৃঃ)। হানাফী ফেকাহ নূরুল আনোয়ারের ভিতরে লেখা হয়েছে فاقرء ما تيسر.....(الخ) এ আয়াত থেকে ইমামের পিছনে কেরাত পড়া ওয়াজেব প্রমাণ হয়। (দেখুন নূরুল আনোয়ার ১৯৩ ও ১৯৪ পৃষ্ঠা,)। অতএব মুক্তাদীকেও সুরা ফাতেহা অবশ্যই পড়তে হবে যাতে তার নামাযের ব্যাপারে একটা নিশ্চয়তা থাকে।

ইমামের পিছনে সূরা ফাতেহা না পড়লে মুক্তাদীর নামায হয় না একথা যেসব হাদীসের কেতাবে এসেছে। বোখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাযাহ; আউনুল মাবুদ, তাবারানী, কেতাবুল কেরাত বায়হাকী। যুযউল কেরাত বোখারী, ইমামুল কালাম; মুয়াত্তা মালেক, সুবুলস সালামে তালখিসুল হাবিব, তানবিরুল হাওয়ালেক। ইত্যাদি। বলাবাহুল্য মক্কা মদিনায় ও ইমামের পিছনে সুরা ফাতেহা পড়া হয়। আল্লাহ সবাইকে আল্লাহর নবী (সঃ) এর সহীহ

হাদীস অনুযায়ী ইমামের পিছনে সূরা ফাতেহা পড়ে নামাযের মত শ্রেষ্ঠ ইবাদাতটি দুরস্ত করে নেওয়ার তৌফিক দিন। আমীন। ২১

২১ বিশ্ব নবী (সঃ) এর নামাযই হানাফী মাযহাবের নামায নামক বই এর লেখক লিখেছেন, বিশ্বনবী (সঃ) এর নামাযের পদ্ধতি হচ্ছে ইমামের পিছনে মুক্তাদীর সুরা ফাতেহা পড়তে হবে না, নীরব থাকবে। এ ব্যাপারে তিনি যেসব দলিল এনেছেন তার সার সংক্ষেপ ঃ

***প্রথম দলিল** হিসাবে তিনি কোরআন থেকে একটি অপ্রাসাংগিক আয়াত এনেছেন*

واذا قراء القران....... (الخ)

অয়াইজা কুরিআল কোরআন ---------- শেষ পর্যন্ত।

পাঠকগণ, সুরা আ'য়াতের এই আয়াতের মর্মের সঙ্গে নামাযে ইমামের পিছনে সুরা ফাতেহা পড়া এবং না পড়ার কোনই সম্পর্ক নেই। কারণ এ আয়াত মক্কায় নাযিল হয়েছে, আর নামাযে সুরা ফাতিহা পড়ার নির্দেশ হিজরাতের পর আল্লাহর নবী (সঃ) দিয়েছেন মদিনায়। আবু হুরায়রা (রা) ৭ম হিজরতে মদিনায় মুসলমান হয়েছেন। আর তাকেই প্রথম মদিনার ওলিতে-গলিতে একথা ঘোষণা দেওয়ার জন্য আল্লাহর নবী (সঃ) হুকুম করেছেন যে সুরা ফাতেহা ছাড়া কারুর কোন নামায হবে না। (দেখুন বায়হাকী ২য়ঃ ৩৭৫ পৃষ্ঠা)। এ আয়াত কখন এবং কোথায় নাজিল হয়েছে তার প্রমাণ ঃ রাসুল (সঃ) যখন মক্কায় সাধারণ ভাবে কোরআন পড়ে পড়ে কাফেরদেরকে শুনাচ্ছিলেন তখন কাফেররা একে অপরকে বলছিল, মুহাম্মাদ যখন কোরআন পড়ে শোনায় তখন তোমরা শুননা "হৈ হল্লা কর, তাহলে তোমরা জয়ী হবে। তখন আল্লাহ সুরা আরাফের ঐ আয়াত নাজিল করেন যে মুহাম্মাদ (সঃ) যখন কোরআন পড়ে তখন কাফেররা হৈ হল্লা না করে যেন কোরআন মনযোগ সহকারে শ্রবণ করে তখন হয়তো তাদের উপর রহম করা হবে। কথাটা আমি সত্য বলছি কি না (দেখুন সুরা হামীম আস্‌সাজদার ২৬নং আয়াত)। কাফেরদের হামীম আস্‌সাজদার ঐ আয়াতের পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত নাজিল হয়েছে তার প্রমাণ দেখুন তফ্‌সিরে কুরতুবী, তফ্‌সিরে কালামুর রহমান, তফসিরে তাবারীতে; এ আয়াত নামায সংক্রান্ত নয়। আর মুফতী ওয়াক্কাসের কথামত তর্কের খাতিরে কিছুক্ষণের জন্য যদি ধরেও নেই যে এ আয়াত নামায সংক্রান্ত তা হলে অত্র আয়াতের হুকুম হচ্ছে, কোরআন সম্পর্কে কোরআনের মা সম্মার্কে নয়। বিস্তারিত আলোচনা দেখুন আমার লেখা ইমামের পিছনে সুরা ফাতেহা পড়ার দলিল আকাশের নক্ষত্রের মত উজ্জ্বল নামক বই এর ১১ থেকে ১৬ পৃষ্ঠা পর্যন্ত।

পাঠকগণ, মাযহাবী মাসলার পক্ষে তারা যখন সহীহ দলিল খুঁজে না পায় তখন মাযহাবী মাসলাটি যে, সঠিক তা প্রমাণ করতে যেয়ে কিছু কৌশল অবলম্বন করেন যেমন ঃ কিছু বর্ণনা তুলে ধরেন যা একেবারে মরদুদ অথবা অ প্রাসংগিক অথবা কিছু বর্ণনা দলিল হিসাবে দেখিয়ে তা পরে আবার সেটাকে দুর্বল বলেদেন, অথবা মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে বলেন এটা ওমুক কেতাবে আছে অথবা হাদীসের ইবারাত আংশিক তুলে ধরে মসলাটি প্রমাণ করার চেষ্টা করেন। আমার বইটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পড়লে সেটা ইনশায়াল্লাহ ধরতে পারবেন।

*এরপর মুসলিম শরীফের উদ্ধৃতি দিয়ে অপ্রাসংগিক ভাবে **দ্বিতীয় দলিলটি** টেনে আনার চেষ্টা করেছেন।*

তিনি লিখেছেন মক্কায় যখন মক্কা বাসীদের নিয়ে রাসুল (সঃ) নামায আদায় করতেন তখন মুশরিকরা কেরাতের আওয়াজ শুনে গালিগালাজ করত। তখন আল্লাহ বলেন-আপনি বেশি উচ্চস্বরে কেরাত পাঠ করবেন না যাতে তারা শুনতে পায় এবং বেশি নিম্নস্বরে পড়বেন না যাতে সাহাবীরা শুনতে না পায়। পাঠকগণ এটাই হচ্ছে ইমামের পিছনে সুরা ফাতেহা না পড়ার দলিল? এখানে যে কেরাতের কথা বলা হয়েছে ওটা সুরা ফাতেহার ব্যাপার নয়, ওটা অন্য কেরাতের কথা বলা হয়েছে। কারণ (১) সূরা ফাতেহা নামাযে পড়ার হুকুম নাযিল হয়েছে মক্কায় নয়, মদিনায়। (২) আয়াতে যদি মুক্তাদি শুধু শুনবে, পড়ার দরকার নেই, ওনার কথা অনুযায়ী ধরে নেই তাহলে রাসুল

(সঃ) তো কোরআন সবার চাইতে বেশি বুঝতেন। তিনি কেন মদিনার অলি-গলিতে একথা ঘোষণা দেওয়ার জন্য আবু হুরায়রা (রাঃ) কে পাঠালেন যে যাও ঘোষণা দিয়ে দাও আজ থেকে যে ব্যক্তি নামাযে সুরা ফাতেহা পড়বেনা তার নামায হবে না। ঐ সময় এক ব্যক্তি আবু হুরায়রা (রাঃ) এর হাত ধরে বললেন, আমরা ইমামের পিছনে থাকলে তাও কি পড়া লাগবে? তিনি বলনে তাও। দেখুন (মুসলিম) এবং রাসুল (সাঃ) কেন মদিনায় মুক্তাদীদের মুখোমুখি হয়ে বললেন যে, ইমামের পিছনে সুরা ফাতেহা না পড়লে কারুর কিন্তু নামায হবে না। (কেতাবুল কেরাত, বায়হাকী) অতএব এ আয়াতে সুরা ফাতেহা পড়া এবং না পড়ার কোন নাম গন্ধ নেই। এটা শুধু নিজের মাযহাবী মাসলার পক্ষে দলিল বানানোর জন্য রাসুল (সঃ) এর সহীহ হাদীস উপেক্ষা করে মন গড়া দলিল বানান হয়েছে মাত্র।

এরপর তিনি **তৃতীয় দলিল** হিসাবে মুসলিম শরীফ থেকে আর একটি দলিল তৈরি করার চেষ্টা করেছেন এভাবে

وفى حديث جرير عن سليمان عن قتادة من الزيادة واذا قراء فانصتوا --- (الخ)

অর্থাৎ ঃ জারীর কাতাদাহ সূত্রে বর্ণিত হাদীসের মধ্যে কলেমা বৃদ্ধি করা হয়েছে, যার অর্থ রাসুল (সঃ) বলেছেন, ইমাম যখন কেরাত পড়বে তোমরা তখন নীরব থাকবে। (মুসলিম ১মঃ ১৭৪ পৃষ্ঠা)।

পাঠকগণ, দেখুন এখানে হাদীসের ইবারাত আগে পিছে বাদ দিয়ে দুরভিসন্ধিমূলকভাবে মাঝখান থেকে খানিকটা তুলে ধরে নিজের মসলার পক্ষে হাদীসটি ফিট করেছেন। হাদীসটির আগে পিছের ইবারাত এভাবে

عن قتادة فى هذه الاسناد بمثله وفى حديث جرير عن سليمان عن قتادة من الزيادة واذاقراء فانصتوا وليس فى حديث احد منهم-

অর্থাৎ ঃ - কাতাদা একইভাবে অন্য সনদে আরও একটি বর্ণনা করেছেন যারির সুলায়মানের মাধ্যমে কাতাদাহ, যার ভিতরে ঐ শব্দগুলি (ইমাম যখন পড়ে তখন চুপ থাক) বর্ণিত হয়নি। ইমাম মুসলিম আরও বলেন, জারির সুলায়মান কাতাদাহ ছাড়া আর যতগুলি সূত্রে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে তার কোন জায়গায় ঐ অতিরিক্ত কথাগুলি (ইমাম যখন পড়ে তখন চুপ থাক) বর্ণিত হয়নি। (দেখুন মুসলিম ১মঃ ১৭৪ পৃষ্ঠা)।

পাঠকগণ, হাদীসটি অন্যখানে বর্ণিত হয়েছে, মুসলিমে নয়। মুসলিমে শুধু আলোচনা করা হয়েছে হাদীসটি সম্পর্কে। আর উনি তো পৃষ্ঠা নাম্বর দিয়েই দিলেন। আর ভক্তগণ মনে করলেন তাই তো আমাদের দলিল তো মুসলিম শরীফে আছে। আরও শুনুন, ঐ অতিরিক্ত কথাগুলি যেখানে বর্ণিত হয়েছে সেই আবু দাউদ ও দারা কুতনী পরিষ্কার বলে দিয়েছেন ঃ যেমন- আবু দাউদ বলেন- ওটা (ইমাম যখন পড়ে তখন চুপ থাক) সুরক্ষিত নয়। (আবু দাউদ ১মঃ ১৪০ পৃঃ)। আর ইমাম দারাকতুনী বলেন ওটা সহীহ নয়। যঈফ। (দেখুন দারাকুতনী ১মঃ ৩২৩ পৃঃ। এহেন প্রত্যাখ্যাত হাদীসের অংশ বিশেষ গোজা মিলের মাধ্যমে মুসলিমের উদ্ধৃতি দিয়ে দেখিয়ে দিলেন যে, হানাফী মাযহারের নামাযের পদ্ধতি সহীহ মুসলিমের হাদীস তথা বিশ্বনবী (সঃ) এর নামাযের পদ্ধতি। তিনি ভেবেছিলেন তার চাতুরী কেউ ধরতে পারবে না। কিন্তু অভিজ্ঞ আহলে হাদীস আলেমদের নিকট এগুলি ধরতে পারা কোন ব্যাপারই নয়। তবে এই চাতুরীর মাধ্যমে দলিল বানানোর জন্য উর্নি হানাফী মাযহাব থেকে পুরস্কৃত হওয়ার যোগ্য।

এরপর তিনি মুসলিম শরীফ থেকে হানাফী মাযহারের পক্ষে আর একটি দলিল কিভাবে তৈরী করতে চাচ্ছেন এবার একটু লক্ষ্য করুন। আর সেটা হচ্ছে তার **৪র্থ নং দলিল**। ইমাম মুসলিমের একজন লেখক ছিলেন তার নাম আবি বাকার। তিনি ইমাম মুসলিমকে বললেন, আবু হুরায়রার এই হাদীসটি কি সহীহ? অর্থাৎ ঃ ইমাম যখন পড়ে তখন চুপ থাক? তখন ইমাম মুসলিম

বললেন, ওটা আমার নিকট সহীহ। বাস্ মুফতী সাহেব পট করে পৃষ্ঠা নাম্বারটা দিয়েই দিলেন। হাদীসের মধ্যখানের এই অংশ টুকু নিজের মসলার সঙ্গে মিল হয়েছে তাই। কিন্তু সামনে কি আছে সেটা যদি প্রকাশ করেন, তাহলে পৃষ্ঠা নম্বর দেওয়া আর ঘটে না। এবার শুনুন ঃ ইমাম মুসলিম আগে কি বলছেন। লেখক বললেন আপনার নিকট যদি কথাটি সহীহ হয় তাহলে আপনি আপনার মুসলিম শরীফে উঠাতে দিচ্ছেন না কেন? এটা আমি মুসলিম শরীফে উঠায়ে দেই? তখন ইমাম মুসলিম বললেন-

كل شئ عندى صحيح ... (الخ) অর্থাৎ প্রত্যেক ঐ জিনিস যেটা শুধু আমার নিকট সহীহ, আমি সেটা আমর মুসলিম শরীফে উঠাতে দেব না। কারণ এ হাদীস সহীহ হওয়াতে সকলেই একমত না। আর আমি আমার এই কেতাবে ঐ সকল হাদীসের স্থান দেব যে হাদীস সহীহ হওয়াতে সকলেই একমত। ইমাম মুসলিম, মুসলিম শরীফে এ হাদীস উঠাতে দেন নাই আর উনিতো পৃষ্ঠা নম্বর দিয়েই দিলেন। (ঘটনাটি দেখুন মুসলিম ১মঃ ১৭৪ পৃষ্ঠা)।

পাঠকগণ, মুফতী সাহেব নামাযে সুরা ফাতেহা না পড়ার ব্যাপারে এসব অগ্রহণযোগ্য দলিল কেন টেনে আনবেন না? সুরা ফাতেহা ইমামের পিছনে মুক্তাদী তো বাড়ীর কাছে- নামাযে তাদের ইমামেরও সুরা ফাতেহা পড়া লাগে না। তাই হেদায়া, কুদুরী, ও ফতহুল কাদীরের ভিতরে লেখা হয়েছে- ফরয নামাযে যদি ইমাম শেষের দু রাকাতে সুরা ফাতেহা না পড়ে শুধু দাঁড়িয়ে থাকে তাহলে তার নামায বেলকুল সহীহ হয়ে যাবে। (দেখুন-হেদায়া, কুদুরী , ফকহুল কাদীর ১মঃ ৩৯৫ পৃষ্ঠা)।

এরপর তিনি আরও কটি গায়ের সহীহ দলিল পেশ করেছেন সেগুলির জবাব দেওয়ার ইচ্ছে হচ্ছে না। বিভিন্ন মহল থেকে আমাকে নিষেধ করা হচ্ছে যে, এসব আজে বাজে কথার জবাব দেওয়ার কি দরকার আছে? এতে সে মনে করছে আমি হয়ত কি যেন একটা হয়ে পড়েছি- ইত্যাদি। তাই অনিচ্ছা স্বত্ত্বেও আমাদের লোকগুলির দিকে তাকিয়ে কিছু জবাব দিতে হচ্ছে।

এরপর **৫নং দলিল** হিসাবে নাসাঈ শরীফ থেকে আবু হুরায়রার উদ্ধৃতি দিয়ে এনেছেন যে, ইমাম নির্দিষ্ট করা হয় অনুকরণের জন্য যখন সে তাকবীর বলবে তখন তোমরা তাকবীর বলবে। আর যখন সে কেরাত পাঠ করবে তখন তোমরা নিরব থাকবে। (নাসাঈ) হাদীসটির মধ্যে মুহাম্মাদ বিন আযলান নামে এক জন বর্ণনাকারী আছে তার কারণে হাদীসটি সহীহ নয় (দেখুন রেজাল তাকরিবুত তাহযীব ২য় ৩৩০ পৃষ্ঠা)।

এরপর **৬নং দলিল** হিসাবে এনেছেন ইবনে মাযা থেকে ঐ একিই কথা ইমাম যখন পড়ে তখন চুপ থাক। জবাব আমার ৩নং দেওয়া জবাবটিই হচ্ছে একই জবাব। হাদীসের অংশ টুকু (ইমামগণ পড়ে তখন চুপ থাক) সহীহ নয়।

এরপর **৭নং দলিল** ইবনে মাযা থেকে এনেছেন ইমামের কেরাতই মুক্তাদির জন্য কেরাত। এ হাদীস একজন মিথ্যাবাদী দারা বর্ণিত; তার নাম জাবেরুল যুফি তাকে যিনি মিথ্যাবাদী বলেছেন তিনি স্বয়ং ইমাম আবু হানিফা। (দেখুন হেদায়া মাযা দেরায়া ১২০ পৃষ্ঠা)।

এরপর মুসলিম থেকে আপ্রাসাংগিক ভাবে **৮নং দলিল** এনেছেন যে রাসুল (সঃ) বলেছেন ঃ কারী (ইমাম) যখন গাইরীল মাগযুবি আলাইহিম অলায যাল্লিন বলবে তখন পিছন থেকে সবাই আমীন বলবে। (মুসলিম) এটা আমীন জোরে বলার হাদীস সুরা ফাতেহা পড়ার নামগন্ধ ও এ হাদীসে নেই তার একটু বোধগম্য থাকা দরকার কারণ আমীন জোরে বলার জন্য যেখানে এ হাদীস আনা হয়েছে সেখানে এ হাদীস কে উনি জীবিত কবর দিয়েছেন। আর সুরা ফাতেহা মুক্তাদীর পড়াকে জীবিত কবর দেওয়ার জন্য আবার সেই হাদীস টেনে এনেছেন; এবং যুক্তি দিয়ে মুক্তাদীর সুরা ফাতেহা না পড়ার দলিল ফিট করেছেন বলছেন পড়া হচ্ছে ইমামের কাজ। তাহলে পড়া যদি শুধু ইমামের কাজ হয়, তাহলে ইমাম তো নামাযে অনেক কিছুই পড়েন কিন্তু মুক্তাদীও আবার তা ইমামের পিছনে আস্তে আস্তে পড়ে থাকেন কেন? যেমন-ইমাম আল্লাহু আকবর বললে মুক্তাদী ও

আল্লাহ্ আকবর বলেন কেন? ইমাম ও সুবহানা রাব্বিয়াল আলা বললে মুক্তাদী ও বলেন কেন? ইমাম আস্‌সালামু আলাইকুম বলে সালাম ফিরালে মুক্তাদী তা আস্তে বলেন কেন? ইত্যাদি সূরা ফাতেহা বাদে সবই পড়েন কেন? মুক্তাদীতো শুধু শুনবে। অতএব এটা হচ্ছে উদুর পিন্ড বুধুর ঘাড়ে।

এর পর **নবম দলিল** হিসাবে মুসনাদে আহমাদ থেকে আবু সায়াদ মুহাম্মাদ বিন সালামের মাধ্যমে এনেছেন। রাসুল (সঃ) বলেছেন ইমাম যখন কেরাতে পাঠ করবে তখন তোমরা নিরব থাকবে। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ঐ একটি দলিল বার বার এনেছেন সংখ্যায় বেশি দেখানোর জন্য। যাই হোক আবু সায়াদ মুহাম্মদ বিন সালাম যঈফ বর্ণনা কারী তাই এ হাদীস সহীহ নয়। (দেখুন আল ইস্তেজকার ১মঃ ৬২ পৃষ্ঠা)। ইমাম যখন পড়ে তখন চুপ থাক কথাটি যতগুলি সুত্রে বর্ণিত তার একটাও সহীহ নয় এটা হাদীস শাস্ত্রবিদ গণের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত। (দেখুন নসবুর রায়া ও মারেফাতুল সুনান)।

পাঠকগণ, মুফতী সাহেব বিশ্বনবী (সঃ) এর নামায হানাফী মাযহাবের নামায তা প্রমাণ করার জন্য বহু চেষ্টা তদবীর গলদ ঘর্ম হয়েছেন তবে মুফতী সাহেব আপনি যতই দলিল তৈরী করে দেখান না কেন ইমামের পিছনে সুরা ফাতেহা না পড়ার কোন সহীহ হাদীস বা আসার হাদীসের পাতায় কোথাও নেই। আর একথা যিনি বলেছেন তিনি হচ্ছেন আপনাদেরই ঘরের একজন প্রখ্যাত 'মুহাদ্দিস আল্লামা আব্দুল হাই লাখনভী (রহঃ) তিনি লিখেছেন- لم يريد فى حديث مرفوع..... .. (الخ)

অর্থাৎ ঃ কোন মারফু সহীহ হাদীসে ইমামের পিছনে সুরা ফাতেহা না পড়ার কথা বর্ণিত হয় নাই। আর এ ব্যাপারে ওলামায়ে আহনাফ (আপনারা) যত দলিল পেশ করছেন হয় তার কোন ভিত্তি নেই মনগড়া, আর না হয় সেটা সহীহ নয়। (দেখুন তালিকুল মুমাজ্জাদ ১০১ পৃষ্ঠা)। মুফতী সাহেব। আজ পর্যন্ত আপনাদের কোন নামধারী মুফতীদের এ হিম্মত হয় নাই এ কথার প্রতিবাদ করার। আর কেয়ামত পর্যন্তও হবে না তাই বলছি আগে ঐ কথার জবাব দিয়ে আসুন, তারপর সহীহ হাদীসের বিরুদ্ধে কলণ ধরুন।

পাঠকগণ, আল্লামা আব্দুল হাইলাখনভী (রহঃ) হানাফী মাযহাবের একজন প্রথম কাতারের মুহাদ্দিস তার কথায় পরিষ্কার বুঝতে পারলেন, যে তারা যত দলিল এ ব্যাপারে এনে থাকেন (তার জবাব তো আমি দিয়েছি) সেগুলির একটাও প্রমাণিত বা সঠিক নয়। অতএব ইমামের পিছনে সুরা ফাতেহা না পড়া কোন দলিল সহীহ হাদীস ভিত্তিক নয়, এবং এটা কখনও বিশ্বনবী (সঃ) এর পদ্ধতি ও নয়। এবার দেখুন মুফতি সাহেব হানাফী মাযহারের বরেণ্য ফেকাহ যার উপর ভিত্তি করে হানাফী মাযহাবের নামাযের মসলা গুলি প্রতিষ্ঠিত সেই ফেকাহর কেতাব থেকে ইমামের পিছনে সুরা ফাতেহা পড়ার প্রমাণ নিন।

বোখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাযাহ, ইবনে হিব্বান, দারাকুতনী ইত্যাদি গ্রন্থে বিশুদ্ধ সনদে এসেছে যে, সুরা ফাতেহা ছাড়া কারুর কোন নামায হয় না। (দেখুন হানাফী ফেকাহ আইনুল হেদায়া ১মঃ ৩৬১ পৃষ্ঠা)। ইমামের পিছনে সুরা ফাতেহা না পড়ার হাদীস সহীহ নয়। (দেখুন- ফেকাহ নুরুল হেদায়া ১১২ পৃষ্ঠা)। ইমামের পিছনে সুরা ফাতেহা মনে মনে পাঠ করবে। উঠাই হক্ক। (আইনুল হেদায়া ১মঃ ৪৪০ পৃষ্ঠা)। ইমামের পিছনে সুরা ফাতেহা সতর্কতা মুলক পড়া উত্তম। (হেদায়া ১মঃ ১০১ পৃষ্ঠা)।

এবার আসুন হানাফী মাযহাবের যারা পূর্বেকার আপনাদের মাযহাবের বিখ্যাত বিখ্যাত মুফতী ছিলেন তারা দেখুন তাদের নিজ নিজ গ্রন্থে ইমামের পিছনে সুরা ফাতেহা পড়ার কথা তুলে ধরেছেন তার প্রমাণ নিন। (যেমন- শাহ ওয়ালিউল্লাহ। হুজ্জুতুল্লাহিল বালেগ ২য় খঃ ঃ ৯ পৃষ্ঠা)। নিযাম উদ্দিন আওলিয়া। (নুযহাতুল খাওয়াতির। ২য়ঃ ১২৬ পৃষ্ঠা।) আব্দুল হাই লাখনভী (ইমামুল কালাম ১৫৬ পৃষ্ঠা)। ভারতের বোখারী আল্লামা আনায়ার শাহ কাশমিরী (রহঃ) (ফসলুল খেতাব ২৯৮ পৃষ্ঠা)। আল্লাম রশিদ আহমদ গাংগুহি। (সাবিলুর রশাদ ২০-২১ পৃষ্ঠা)। আল্লামা শামসুল হক ফরিদপুরী, (তাফসিরে হক্কানী ও অছিয়ত নামা ৭নং অসিয়ত)। ইত্যাদি।

সুরা ফাতেহা শেষে আমীন বলা

আমীন শব্দের অর্থ- কবুল করা। (ইবনে কাসির ৩২ পৃষ্ঠা)। যেহেরী নামাযে ইমামের পিছনে সুরা ফাতেহা পাঠ শেষে ইমাম মুক্তাদী সকলেই উচ্চঃস্বরে আমীন বলবে। সাহাবীদের মধ্যে ইমাম মুক্তাদী সকলেই যেহরী কেরাতে স্বজোরে আমীন বলতেন।(বোখারী ১০৭ পৃঃ)। তখন থেকে আজ পর্যন্ত মসজিদুল হারামে এবং নবী (সঃ) এর মসজিদে নব্বীতে যেহেরী নামাযে সুরা ফাতেহা পাঠের পর আমীনের আওয়াযে গম গম করছে। প্রয়োজনে হাজী সাহেবদের কাছে জেনে দেখুন। ইমামের আমীন বলার সাথে সাথে মুক্তাদী আমীন বলবে ইমামের আগে নয়। রাসুল (সঃ) যেসব নামাযে কেরাত জোরে পড়তেন সে সব নামাযে আমীন ও জোরে বলতেন। এবং তার পিছনে যারা থাকতেন তারাও আমীন জোরে বলতেন। (যাদুল মায়াদ ১ম ৫২)।

ইমাম সাহেব আমীন জোরে বলবেন

عن وائل بن حجر (رض) قال كان رسوال الله ﷺ قرأ ولاضالين قال امين ورفع بها صوته

১। অর্থাৎ ঃ ওয়াইল বিন হুযর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুল (সঃ) والضالين বলার পর জোরে আমীন বলতেন। (আবু দাউদ ইবনে মাযাহ-)

عن وائل بن حجر (رض) انه صلى خلف رسول الله ﷺ فجهر بامين-

২। অর্থাৎ ঃ ওয়াইল বিন হুজর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা তিনি রাসুল (সঃ) এর পিছনে নামায আদায় করেন। তিনি আমীন জোরে বল-লেন।(আবু দাউদ ১মঃ ১৩৪ পৃষ্ঠা)।

عن وائل بن حجر (رض) قال سمعت رسول الله ﷺ قرأ غير المغضوب عليهم والاضالين فقال امين ومد بها صوته-

৩। অর্থাৎ ঃ - ওয়াইল বিন হুযর (রা) বলেন আমি রাসুল (সঃ) কে গায়রিল মাগযুবি আলাইহিম অলায যোয়াল্লিন বলার পর আমীন উচ্চঃস্বরে বলতে

শুনেছি।(তিরমিযী আবু দাউদ ইবনে মাযা)।

عن ام حصين (رض) انها كانت تصلى خلف النبى ﷺ
فى صف النساء فلما قال ولا الضالين قال امين حتى
سمعته وانا فى صف النساء ـ

৪। অর্থাৎ ঃ- (এক নারী সাহাবী) উম্মে হুসাইন (রা) থেকে বর্নিত তিনি রাসুল (সঃ) এর পিছনে মেয়েদের কাতারে নামায পড়ছিলেন। তিনি বলেন, রাসুল (সঃ) ওয়ালায যোয়াল্লিন পাঠ করার পর আমীন বললেন। আমি পিছনে মেয়েদের কাতার হতে তা শুনতে পেলাম।(মাযমাউজ যাওয়াদের ১৮৭ পৃষ্ঠা)।

মুক্তাদী আমীন জোরে বলবেন

রাসুল (সঃ) বলেছেন– اذا امن الامام فامنوا

১। অর্থাৎ ঃ- ইমাম যখন আমীন বলে তোমরা ও আমীন বলবে। (বোখারী ১মঃ ১০৭ পৃষ্ঠা)।

ইমামের আমীন শুনে মুক্তাদী আমীন বললে অবশ্যই ইমামকে আমীন জোরে বলতে হবে। তাই এ হাদীস ইমাম মুক্তাদি উভয়ই আমীন উচ্চঃস্বরে বলার নির্দেশ রয়েছে। অন্য হাদীসে এসেছে ।

২। রাসুল (সাঃ) বলেছেন- 'তোমাদের কেউ যখন আমীন বলে তখন আসমানে ফেরেস্তারাও আমীন বলে। যার আমীন বলা তাদের আমীনের মোতাবেক হয় তার আগে পিছের সব গুনাহ মাফ হয়ে যায়। (বোখারী মুসলিম) হযরত আতা (রহ) বলেন,

وقال عطاء امين دعا وامن ابن الزبير ومن وراءه حتى
ان للمسجد للجة

৩। অর্থাৎ ঃ হযরত আতা (রহঃ) বলেন আমীন হল দোয়া। তিনি আরও বলেন আব্দুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রাঃ) ও তার পিছনে যারা ছিলেন তারা এমন জোরে আমীন বলতেন যে মসজিদ গম গম করে উঠত। (বোখারী ১মঃ ১০৭ পৃষ্ঠা)।

وقال عطاء .... (الخ) হযরত আতা বলেন, আমি অন্তত দুইশত সাহাবীকে এমন পেয়েছি যে যখন ইমাম ولاالضالين বলতেন তখন তারা

উচ্চস্বরে আমীন বলতেন। (বায়হাকী, ইবনে হিব্বান)। হাদীস সহীহ।

অতএব যে সব নামাযের সুরা ফাতেহা জোরে পড়তে হয়। সে সব নামাযে আমীন ও জোরে বলতে হয়।

আমীন জোরে বলার হাদীসের মধ্যে বিভিন্ন শব্দ এসেছে এ রকম جهر، مد، رفع، ارتج- যাহারা, মাদ্দা, রাফায়া, ইর্তাজ্জা। সাধারণ ভাবে শব্দ গুলির অর্থ উচ্চঃস্বরে বলা। মুক্তাদীর জন্য আমীন উচ্চঃস্বরে বলা যেসব হাদীসের গ্রন্থে এসেছে। বোখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, মুয়াত্তা মালেক, রফউল ইয়াযাহ, দারা কুতনী, ইবনে আদি শায়বা, ফতহুন বয়ান, মুসনাদে শাফেয়ী, আত-তারগীব, আলমুন তাকা, মাজ মাউল বিহার, তালখিছুল হাবিব, তোহফাতুল আহ্ওয়াজী, ফতহুল বারী, নাইলুন আওতা তানবিরুল হাওয়ালেক ইত্যাদি। ২২

২২ বিশ্বনবী (সঃ) এর নামাযই হানাফী মাযহাবের নামায নামক বই এর লেখক লিখেছেন, আমীন নিরবে পাঠ করতে হবে। দলিল দিতে যেয়ে ***প্রথমে এনেছেন*** *সুরা আরাফের ৫৫নং আয়াত*

ادعوا ربكم تضرعا وخفية

অর্থাৎ ঃ- তোমরা পরোয়ার দেগারের নিকট বিনয়ের সহিত আস্তে দোয়া কর। আর বোখারীতে এসেছে আমীন একটি দোয়া। অতএব আমীন আস্তে হবে।

*পাঠকগণ, কোরআন মুফতী সাহেবের চেয়ে কোটি কোটি গুণ বেশি যিনি বুঝতেন তিনি হচ্ছেন মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ (সঃ)। কিন্তু দেখা যায় রাসুল (সঃ) অনেক দোয়া উচ্চঃস্বরে পড়েছেন। * যেমন মুসলিম শরীফে এসেছে আতা বিন মালেক হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসুল (সঃ) এক জানাযা পড়লেন এবং নিম্নের দোয়াটি উচ্চঃস্বরে পড়লেন। (الخ) ..... اللهم اغفرلى حينا*

আল্লাহুমাগ ফিরলী হাইয়্যেনা--- শেষ পর্যন্ত (মুসলিম ৩১১ পৃঃ)।

** আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন একবার কাবা শরীফের নিকটে রাসুল (সঃ) কাফেরদের জন্য উচ্চঃস্বরে বদ দোয়া করছিলেন। (الخ) ...... فلما سمع ذالك*

অর্থাৎ ঃ- যখন তারা বদ দোয়ার শব্দ শুনতে পেল তখন তাদের থেকে হাসি চলে গেল, এবং বদ দোয়ার কারণে ভীত হয়ে গেল। (মুসলিম ২য় ১০৮ পৃষ্ঠা)।

** মুসা বিন উকবা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন (الخ).... انها سمعت অর্থাৎ ঃ নবী (সঃ) কে কবরের আযাব থেকে পানাহ চাইতে আমি নিজ কানে শুনেছি। (বোখারী ১মঃ ১৮৪ পৃঃ। এ ছাড়াও আল্লাহর রাসুল বহু দোয়া উচ্চঃস্বরে পড়েছেন।*

তাই কোরআনের সাধারণ অর্থ এক রকম বুঝে আসলেও রাসুল (সঃ) হচ্ছেন সর্বোত্তম অনুসরণীও ব্যক্তি কারণ আল্লাহ বলেন, (الخ)...... لقد كان لكم فى رسول الله

নিশ্চয় রাসুল (সাঃ) তোমাদের জন্য উত্তম অনুসরণীয়।

অতএব, যে সকল জায়গায় রাসুল (সঃ) দোয়া উচ্চঃস্বরে পড়েছেন আমরাও সে সব জায়গায় দোয়া উচ্চ স্বরে পড়তে পারব। আর যেসব দোয়া রাসুল (সঃ) উচ্চঃস্বরে পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন তার তো প্রশ্নই উঠে না।

তিনি লিখেছেন, বোখারী শরীফের ১০৭ পৃষ্ঠায় আমীন কে দোয়া বলা হয়েছে অতএব আমীন নীরবে হবে। মুফতী সাহেব যেটা বলেছেন ওটা তিনি ঠিকই বলেছেন, কিন্তু উনিতো আবার হানাফী মাযহাবের নীল চশমা পরে হাদীস দেখেন? তাই ইবারাতের অর্ধেক টা তার চোখে পড়ে, বাকিটা তিনি দেখতে পান না। ওখানে দেখুন আমীন দোয়া বলার সাথে সাথে আতা বলেন, দোয়াটি উচ্চঃস্বরে পড়তে হবে। (দেখুন-বোখারী ১ম ঃ ১০৭ পৃষ্ঠা) । মা-মেয়েকে বলছিল মেয়ে, শ্বশুর বাড়ী যাবি না। তখন মেয়ে বলেছিল, মা- তুমি কোথায় দাঁড়িয়ে বলছ? অর্থাৎ ঃ - তুমি শ্বশুর বাড়ী দাঁড়িয়ে আমাকে বলছ, মেয়ে শ্বশুর বাড়ী যাবি না? এদের হয়েছে তাই। তাদের এমন কোন মসজিদ নেই যেখানে নামায শেষে ইমাম উচ্চঃস্বরে দোয়া পাট করে না। এবং মুক্তাদী উচ্চঃস্বরে আমীন আমীন বলে না। তারপর আমীন আস্তে বলার আর একটি **দ্বিতীয় দলিল** আবু দাউদ হতে বানানোর চেষ্টা চালিয়েছেন যে, রাসুল (সঃ) নামাযে দুটি নীরবতা পালন করেছেন। একটি হচ্ছে তাকবীরে তাহরিমার পর, আর একটি হচ্ছে সুরা ফাতেহা শেষে আমীন বলার পর। এটা হচ্ছে সাক্তার (নীরবতা) হাদীস। প্রথম নীরবতায় সানা পড়ার বিধান আছে। আর দ্বিতীয় নীরবতায় সুরা ফাতেহা পড়ারও বিধাম রয়েছে। তো এ হাদীস হচ্ছে নীরবতার হাদীস। আর আমীন তো নীরবতা নয়, ওতো পড়তে হয় কেউ স্বরবে কেউ নীরবে। আমীন বলার সঙ্গে এর সম্পর্ক কোথায়? উদর পিন্ড বুধুর ঘাঁড়ে এ ধরণের দলিল অদ্যবধি কেউ আবিষ্কার করেছেন তা আমার জানা নেই।
এরপর আর একটি দলিল **তৃতীয় দলিল** তিরমিযী থেকে এনেছেন। যে, রাসুল (সঃ) গায়রিল মাগযু বিআলাইহিম, অয়ালায যোয়াল্লিন বলার পর আমীন বললেন وخفظ بها صوته
অর্থাৎ ঃ- আমীনের শব্দ আস্তে হল।
মুফতী ওয়াক্কাস আলী একবার আমার সাথে বাহাস করতে এসে (মল্লিক বাড়ী মাদ্রাসায়) আমাকে বললেন, আমীন আস্তে বলার হাদীস আছে। তিরমিযীর ভিতরে। আমি বল্লাম কোথায় দেখান? উনি বললেন এই দেখুন
وخفض بها صوته অর্থাৎ আমীনের শব্দ আস্তে হল। আমি বললাম বেশ, গোটা সেহা সেত্তার মধ্যে একটি মাত্র হাদীস বের করলেন ঠিক আছে- এবার আপনি একটু দেখান শব্দ কিভাবে আস্তে হয়। কারণ "খাফাযা" মানে আস্তে আর "সাউত" মানে শব্দ। তখন তিনি গলাটা খাক্‌রিয়ে আমীনটা শব্দ করে বলে দেখালেন ওই বাহাসে যত লোক ছিল তারা সবাই শুনছিলেন এবং হাসছিলেন (মাইক ছিল না) আমি বল্লাম কই নীরব হল কৈ? আপনার আমীনের শব্দ তো এখানে যত লোক আছে সবাইতো শুনলেন। যাক, এবার একটু আগে পড়ুন তো?
গাঠকগণ উনি আগে পড়লেন তার অর্থ হচ্ছে ইমাম তিরমিযী বলেন এই হাদীসটির কয়েক জায়গায় ভুল আছে। তার এক জায়গা হচ্ছে যেখানে আছে আমীনের শব্দ আস্তে হল ওটা ভুল। ওটা আস্তে হবে না ওটা জোরে হবে, বর্ণনা কারী বলতে যেয়ে ভুল করেছেন। (দেখুন-তিরমিযী ১ম ৩৪ পৃষ্ঠা) । অথচ একটু উপরে দেখুন, ইমাম তিরমিযী আমীন উচ্চ স্বরে বলতে হবে হাদীসটি এনেছেন, এবং বলেছেন হাদীসটি সনদ হাসান। (ভাল) এটাতো উনি দেখবেন না কারণ উনিতো মাযহাবী চশমা পরে রয়েছেন। এ চশমা একবার যিনি পরেছেন তিনি মাযহাবী মাসলার পক্ষে যেসব কথা রয়েছে তা ছাড়া আর কিছুই ও চশমায় দেখতে পান না। এই হচ্ছে বিশ্বনবী (সঃ) এর নামাযই হানাফী মাযহাবের নামায নামক বই এর দলিলের অবস্থা আল্লাহ আমাদের সবাইকে মাযহাবী সংকীর্ণতা নয় কোরআন ও সহীহ হাদীসের উপর আমল করার তৌফিক দিন। আমীন।
মুফতী ওয়াক্কাস আলী সাহেব লিখেছেন ওরা (আহলে হাদীসরা) বৃটিশ সরকারের মদদ পুষ্ট। আর মুফতী আবুল কাশেম সাহেব লিখেছেন বৃটিশ সরকার ১২৪৬ হিজরীতে আহলে হাদীস নাম বরাদ্দ দেয়। (আগে এদের নাম গন্ধ ও ছিল না) এই অনুচ্ছেদের মধ্যে মুফতী ওয়াক্কাস আলী তার বই এর ৬৩ পৃষ্ঠায় লিখেছেন- ইসলামের স্বর্ণ যুগের পর থেকেই এরা আমাদের বিরুদ্ধাচারণ করে আসলেও

আল হামদুলিল্লাহ এখনও আমরা শতকরা ৭৫ ভাগ হানাফী মাযহাবের অনুসারী আছি। পাঠকগণ আহলে হাদীসদের জন্ম যদি ১২৪৬ হিজরীতে হয় তাহলে রাসুলের স্বর্ণ যুগের পর থেকে তাদের বিরুদ্ধাচারণ করলো কারা? আর আমিও মুফতী সাহেবের সঙ্গে আল-হামদু লিল্লাহ না বলে ও পারছি না। যে আমরা সংখ্যায় কম হতে পেরেছি। কারণ আল্লাহ বলেন, قليل من عبادى الشكور। -অর্থাৎ আমার শুকর গোজার লোকের সংখ্যা কম। (সাবা -১৩ নং আয়াত) । অপরদিকে আল্লাহ বলেন اكثرهم لا يعقلون। অর্থাৎ অধিকাংশ লোক কান্ডজ্ঞান শূন্য (ইউসুফ)

ان تطع اكثر من فى الارض يظلوك عن سبيل الله ان يتبعون الا الظن وان هم لا يخرصون

যদি আপনি অধিকাংশ লোকের কথা শোনেন বা অনুসরণ করেন তবে তারা আপনাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিবে।তারা তো কেবল ধারনার অনুরসণ করে এবং ধারনা ভিত্তিক কথা বলে। (আনয়াম ১১৬ নং আয়াত)
<u>এবার আসুন মুফতী সাহেব আমীনের শব্দ শুনলে তো আবার আপনাদের গা জ্বলে উঠে, এবং এ তো জ্বলে যে একবার খুলনা মক্কি মসজিদ থেকে আমাদের কিছু ভাইকে বের করে দেওয়া হয়েছিল। তাহলে এবার শুনুন, যারা আমীনের শব্দ শুনে হিংসা করে তাদের সম্পর্কে আল্লাহর নবী (সঃ) কি বলেছেন</u>

عن عائشة (رض)...... من قول امين

অর্থাৎ ঃ- হযরত আয়শা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসুল (সঃ) বলেছেন, ইয়াহুদীরা তোমাদের প্রতি এতোটা হিংসা অন্য কোন বিষয়ে করে না, যতটা হিংসা সালাম দেওয়া ও আমীন উচ্চস্বরে বলাতে করে। অতএব, তোমরা বেশি করে জোরে আমীন বল, (ইবনে খুযায়মা , ইবনে মাযা- ১মঃ ৬২ পৃষ্ঠা) ।

ইমামের পিছনে ফরয নামাযে আমীন বললে মুসলমানদের উপর ইয়াহুদিদের হিংসা হয়। (দেখুন মাযমাউজ জাওয়ায়েদ ১ম ১৮৬ পৃষ্ঠা)। এই হাদীস খানা সম্পর্কে আল্লামা হায়াত সিন্দী হানাফী (রহঃ)- বলেন, اسناده صحيح এ হাদীসের সনদ সহীহ ورجاله ثقة এবং বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত। (দেখুন ইবনে মাযা আরবী ১৪৫ পৃষ্ঠা।) আমীনের শব্দ শুনে হিংসা করা ইয়াহুদীদের স্বভাব এই মর্মে রাসুল (সঃ) এর হাদীস যে সব গ্রন্থে পাওয়া যাবে- ইবনে মাজাহ, রফউল ইজাজাহ, ইবনে কাছির, কাঞ্জুল উম্মাল, নাইলুল আউতাব, আত তারগীর, জামেউল ফাওয়ায়েদ ইত্যাদি।
<u>এবার আসুন মুফতী সাহেব আমীন জোরে বলার প্রমাণ হানাফী মাযহাবের ফেকাহ হতে নিন।</u>
আমীন হচ্ছে কবুলিয়াতের মহর। (দেখুন হানাফী ফেকাহ আইনুল হেদায়া ১মঃ ৩৬৪ পৃষ্ঠা)। প্রকাশ্য আমীন বলা প্রমানিত। (হানাফী ফেকাহ নূরুল হেদায়া ৯৭ পৃষ্ঠা)। ইমামের আমীন শুনে মুক্তাদী আমীন বলবে। (দুর্রে মুখতার গায়াতুল আওতার ১মঃ ২২৯ পৃষ্ঠা) । দু এক জন শুনলে সেটা শোনার মধ্যে হয় না। সকল লোককে শুনতে হবে। (ফেকাহ গায়াতুল আওতার ১মঃ ২৪৯ পৃষ্ঠা, হাকিকাতুলফেকাহ ১মঃ ১৮৮ পৃঃ) । আস্তে আমীন বলার হাদীস দুর্বল। (ফেকাহ আইনুল হেদায়া ১মঃ ৩৬৩ পৃষ্ঠা) ।
<u>এছাড়া হানাফী মাযহারের যারা প্রথম সারির বিদ্বান বা মুফতী তারাও আমীন জোরে বলার পক্ষে রায় দিয়েছেন-</u> যেমন- শাহওয়ালি উল্লাহ, আল্লামা আব্দুল হক্ক মুত্তাদ্দিস দেহলভী, বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানী, আল্লামা আব্দুল হাই লাখনভী, (রহঃ) তারা তাদের নিজ নিজ কেতাবে সেটা তুলে ধরেছেন। আল্লামা আঃ হাই নাখলভী হানাফী এটাও বলেছেন যে, ইনসাফের কথা এই যে, দলিলের দিক বিবেচনা করলে জোরে আমীন বলাই উত্তম প্রমাণিত। (দেখুন- তালিকুল মুমাজ্জাদ ১০৩ পৃঃ) । বলা বাহুল্য

মক্কা মদিনায় ও আমীন জোরে বলা হয়। হে আল্লাহ আমাদের সবাইকে নামধারী মুফতীদের হাত হতে রক্ষা করে সহীহ হাদীসের উপর আমল করার তৌফিক দিন। আমীন।

জনাব মুফতী ওয়াক্কাস আলী তার বই এর ২, ৩, ৪, ৫, ৬ অনুচ্ছেদে কয়েকটি বিষয়ে আলোচনা করেছেন। যেমনঃ রেজাল সাস্ত্রের মানদন্ডে ইমাম আবু হনিফা (রহঃ)। ইমাম আবু হানিফা ৩০ বৎসর একাধারে রোজা ও ৪০ বৎসর ঘুমান নাই। ইমাম আবু হানিফার মতা মতই হানাফী মাযহাবী গনের মতামত, মাযহাব কেন মানতে হবে, ইত্যাদি। এগুলির জবাব পাবেন আমার লেখা "ইমাম আবু হানিফার উপর মিথ্যা ভিত্তিহীন অভিয়োগের জবাব নামক লেখনীর সমুচিত জবাব নামক বইটিতে। সেখানে আমি মাযহাব কেন মানতে হবে না। ইমাম আবু হানিফার মতামত কখনও হানাফী মাযহাবীগণের মতামত নয়। ইমাম সাহেব ৩০ বৎসর একাধারে রোযা ও ৪০ বৎসর ঘুমান নাই। এসব হাদীস বিরোধী কথা তাঁন নামে মিথ্যা অপবাদ। ইমাম আবু হানিফার উপর মিথ্যা ভিত্তিহীণ অভিযোগে কলঙ্কিত আমরা করেছি না মাজহাবি ভাইয়েরা করেছেন? হানাফী মাজহাব কখনও ইমাম আবু হানিফার মাযাহাব নয়। ইমাম আবু হানিফার মাযহাব ছিল সহীহ হাদীস। অত্র বই এর কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় উক্ত বিষয় গুলির প্রমানাদীসহ বিস্তারিত আলোচনা আমি সেখানে তুলে ধরেছি। বইটি প্রকাশের পথে।

সূরা ফাতেহার পর নামাযে কেরাত পাঠ

রাসুল (সঃ) ফাতেহা পড়ার পর একটু দম নিতেন। তার পর বিসমিল্লাহির রাহমানির রহিম পড়তেন। (সিহা সিত্তা) কমে ৩ আয়াত উর্ধে ৩০/৪০/৬০ এরও বেশি ১শত আয়াত পর্যন্ত পড়া যেতে পারে। (তিরমিযী)। প্রতিটি সুরা কেরাত ও দোয়া বুঝে না পড়লে নামাযে মন বসানো যায় না। এবং শাদও পাওয়া যায় না। ফলে বিভিন্ন চিন্তা মনের মধ্যে চলে আসে। এছাড়া রাসুল (সঃ) বলেছেন- আল্লাহর বান্দা তার নামাযের অতটুকু অংশ পাবে যতটুকু সে ওর মধ্যে বুঝে থাকে। (মেফতা-হুস সায়েদা)। তাই সাধারণ মুসল্লীদের সুবিধার্থে কোরআন থেকে কতিপয় মহাত্মপূর্ণ ৬টি ছোট ছোট সুরার উচ্চারণ ও অর্থ সংক্ষিপ্ত ভাবে দেয়া হল।

সূরা আল-আসর

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالْعَصْرِ- اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِىْ خُسْرٍ- اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحَاتِ وَتَوَا صَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَا صَوْا بِالصَّبْرِ

উচ্চারণ ঃ (১) ওয়াল্ 'আসরি, (২) ইন্নাল্ ইন্সা-না লাফী খুস্রি (৩) ইল্লাল্লাযীনা আ-মানু ওয়া 'আ-মিলুস্ সালিহা-তি ওয়াতাওয়া-সাওবিল্ হাক্কি-ওয়া তাওয়া-সাও বিস্সাব্র।

অর্থ ঃ (১) আসরের (কাল প্রবাহের) কসম! (২) নিশ্চয়ই মানুষ অবশ্যই ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। (৩) কিন্তু যারা (আল্লাহকে) বিশ্বাস করে এবং ভাল কাজ করে, আর একে অপরকে সত্যের উপদেশ দান করে এবং (বিপদে-আপদে) পরস্পরকে ধৈর্যধারণের পরামর্শ দান করে (তারা ঐ ক্ষতির মধ্যে নহে)।

সূরা আল কাওসার

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ- فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ- اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ

উচ্চারণ ঃ (১) ইন্না-আ'তাইনা-কাল্ কাও্ছার (২) ফাসল্লি লিরব্বিকা ওয়ান্হার (৩) ইন্না শা-নিআকা হুআল আব্তার।

অর্থ ঃ (১) (হে মুহাম্মদ!) নিশ্চয়ই আমি তোমাকে কাও্ছার দান করেছি। (২) অতএব তুমি (ঐ মহাদানের কৃতজ্ঞতা স্বরূপ) তোমার প্রতি পালকের উদ্দেশ্যেই নামায আদায় কর এবং কুরবানী কর। (৩) নিঃসন্দেহে তোমার দুশমনই লেজ কাটা বা নির্বংশ।

সূরা আল কা-ফিরূন

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ- لَا اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ- وَلَا اَنْتُمْ عَابِدُوْنَ مَا اَعْبُدُ- وَلَا اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ- وَلَا اَنْتُمْ عَابِدُوْنَ مَا اَعْبُدُ- لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِىَ دِيْنِ

উচ্চারণ ঃ (১) কুল ইয়া-আইয়্যুহাল্ কা-ফিরুন। (২) লা-আ'বুদ মা-তা'বুদুন। (৩) ওয়ালা-আন্তুম্ আ-বিদূনা মা-আ'বুদ। (৪) ওয়া লা-আনা-আ-বিদুম্ মা-আবাদ্তুম। (৫) ওয়ালা-আন্তুম্ আ-বিদূনা মা-আবুদ। (৬) লাকুম্ দীনুকুম্ ওয়ালিয়া দীন।

অর্থ ঃ (১) (হে মুহাম্মদ) তুমি বলে দাও ওহে সত্য প্রত্যাখ্যানকারী কাফিরগণ! (২) আমি তার ইবাদত করি না তোমরা যার পূজা কর। (৩) আর তোমরাও তাঁর পূজারী নও আমি যাঁর ইবাদাত করি। (৪) এবং আমি তার ইবাদাতকারী হব না তোমরা যার পূজা করে আসছ। (৫) আর তোমরাও তাঁর পূজারী হবে না আমি যাঁর ইবাদাত করছি। (৬) (অতএব) তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম এবং আমার জন্য আমার দীন।

সূরা আল-ইখলাস

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ- اَللّٰهُ الصَّمَدُ- لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ- وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ

উচ্চারণ ঃ (১) কুল্ হুয়াল্লাহু আহাদ। (২) আল্লা হুস্‌সামাদ। (৩) লাম্ ইয়ালিদ। (৪) ওয়া লাম্ ইউলাদ। (৫) ওয়া লাম্ ইয়াকুল্লাহূ কুফুওয়ান্ আহাদ।
অর্থ ঃ (১)(হে নবী) তুমি বলে দাও সেই আল্লাহ একক, (২) যে আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন (অথচ সবাই তাঁরই মুখাপেক্ষী), (৩) তিনি (কাউকে) জন্ম দেননি এবং (কারো হতে) তিনি জন্মলাভও করেনি। (৪) আর তাঁর সমকক্ষ কেউই নেই।

সূরা আল্-ফালাক

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ- مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ- وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ- وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ- وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ

উচ্চারণ ঃ ১। কুল আউযু বিরাব্বিল্ ফালাক্, ২। মিন্‌শাররি মা-কালাক্ব, ৩। ওয়ামিন শার্‌রি গা-সিক্বিন ইযা-ওয়াক্বাব, ৪। ওয়ামিন্ শার্‌রিন নাফ্‌ফা-ছা-তি ফিল 'উকাদ। ৫। ওয়ামিন্ শার্‌রি হা সিদিন্ ইযা-হাসাদ।
অর্থ ঃ ১। তুমি বল! আমি ভোরের প্রতি পালকের আশ্রয় চাচ্ছি। ২। সেই সমস্ত জিনিষের অনিষ্ঠ থেকে যা তিনি সৃষ্টি করেছেন। ৩। এবং অন্ধকারের অনিষ্ট থেকে যখন তা (বিশ্ব চরাচরকে) ঢেকে নেয়, ৪। আর গিরাসমূহে ফুঁক দানকারীদের দুষ্কৃতি থেকে, ৫। এবং হিংসুক ব্যক্তির ক্ষতি থেকে।

সূরা আন্-নাস

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ- مَلِكِ النَّاسِ- اِلٰهِ النَّاسِ- مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ- اَلَّذِيْ يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ

উচ্চারণ ঃ (১) কুল, আ'উযু বিরাব্বিন্ না-স, (২) মালিকিন না-স, (৩) ইলা-হিন্ না-স, (৪) মিন্ শার্‌রিল্ ওয়াস্‌ওয়া-সিল খান্না-স, (৫) আল্লাযী ইউওয়াসবিসু ফী সুদূরিন্না-স, (৬) মিনাল্ জিন্নাতি ওয়ান্‌না-স।
অর্থ ঃ (১) তুমি বল, আমি মানুষের প্রতি পালকের, (২) মানুষের মালিকের, (৩) মানুষের উপাস্যের আশ্রয় প্রার্থনা করছি, (৪) সেই লুকায়িত কুমন্ত্রণা দানকারীর দুষ্কৃতি থেকে, ৫। যে মানুষের অন্তরসমূহে কুমন্ত্রণা দান করে, (৬) জিন ও ইনসানের মধ্য হতে।

নামাযে রফউল ইয়াদাঈন করা

রাসুল (সঃ) যখন কেরাত শেষ করতেন তখন একটু বিরতি দিতেন এবং রফউল ইয়াদাঈন (দুহাত উত্তোলন) করে রুকুতে যেতেন। রাসুল (সঃ) যখন নামায শুরু করতেন এবং যখন রুকুতে যেতেন এবং যখন রুকু থেকে মাথা উঠাতেন তখন রফউল ইয়াদাঈন (দুহাত উত্তালন) করতেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন

ان رسول الله ﷺ كان يرفع يديه حذ و منكبيه اذا افتتح الصلاة واذا كبر للركوع واذارفع راسه من الركوع رفع هما كذالك

অর্থাৎ - নিশ্চয় রাসুল (সঃ) যখন নামায আরম্ভ করতেন তখন দুই হাত কাধ বরাবর উঠাতেন, এবং যখন রুকুতে যেতেন তখন ও ঐ রূপ করতেন এবং যখন রুকু থেকে মাথা উঁচু করতেন তখনও হস্তদ্বয় কাধ পর্যন্ত ওঠাতেন। (বোখারী, মুসলিম, মুয়াত্তা মালেক, মুয়াত্ত মুহাম্মাদ ৮৯ পৃঃ)। ইত্যাদি বহু গ্রন্থে। হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।
রফউল ইয়াদাইন করার হাদীস সেহাহ সেত্তাতেই মোট ১৯টি সহ ৪শত হাদীস ও আসারে হাদীস রয়েছে।(সিফরুস সাআদাত ১৫ পৃষ্ঠা)। রফউল ইয়াদাইনের হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীর সংখ্যা ৫০। যার মধ্যে জান্নাতের সু-সংবাদ প্রাপ্ত ১০ জন সাহাবী ও রয়েছেন।(দেখুন কেতাবুত তাকরিবুল মাসানিদ অয়া তারতিবুল আসানিদ ১৮ পৃষ্ঠা)।
বিশিষ্ট তাবেয়ী হাসান বসরী (রহ) বলেন– সাহাবাগণ যখন রুকু করতেন এবং রুকু থেকে মাথা উঠাতেন তখন রফউল ইয়াদাইন করতেন।(খুয বোখারী, বায়হাকী ২য় খঃ ৭৫ পৃষ্ঠা)।
রাসুল (সঃ) এর ১ লক্ষ ২৪ হাজার সাহাবীর মধ্যে একমাত্র ইবনে মাসউদ

ছাড়া বাকি সকলেই রফউল ইয়াদাঈন করতেন। (ফতহুল বারী ১মঃ ২১৯ পৃষ্ঠা)। তবে ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে সঠিক মতনে বর্ণিত হাদীষটি দেখূন রফউল ইয়াদাইন করার পক্ষে রয়েছে।(যুয রফউল ইয়াদাইন বুখারী ১৪ পৃষ্ঠা)

রাসুল (সঃ) নামায ফরয হওয়া থেকে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত নামাযে রফউল ওয়াদাঈন করেছেন। প্রামাণ-

عن عبد الله عمر (رض)------ فمازالت تلک الصلاة حتی لقی الله تعالی

অর্থাৎ ঃ- আব্দুল্লাহ বিন ওমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসুল (সঃ) যখন নামায শুরু করতেন তখন হস্তদ্বয় কাঁধ বরাবর উঠাতেন এবং যখন রুকুর জন্য তাকবির দিতেন এবং যখন রুকু থেকে মাথা ওঠাতেন তখনও ঐ রূপ দুই হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠাতেন। এই রকম নামায রাসুল (সঃ) মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত পড়েছেন। (রায়হাকী ২য়ঃ ৭৫ পৃঃ। তালখিসুল হাবিব ১মঃ ৮১ পৃষ্ঠা। দিরাসাতুল লবীব ১৭০ পৃষ্ঠা)।

রফউল ইয়াদাঈনের হাদীস সেহাহসিত্তা ছাড়াও যে সব হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে– যুয বোখারী, মুয়াত্তা মালেক, বায়হাকী, মুসনাদে আহমাদ, তালখিস, মুয়াত্তা মুহাম্মাদ, আল মুস্তাদরাক, ফতহুল বারী, তান বিরুল হাওয়ালেক, উম-দাতুল কারী, তালিকুল মুমাজ্জাদ, আলমুগণী, তুহফাতুল আহওয়াজী, দেরাসাতুল লবীব, দারেমী, দ্বারাকুতনী, সুবুলুস সালাম, তহাবী, যাদুল মায়াদ, আব্দুর রাজ্জাক ইত্যাদি।

মক্কা মদিনাসহ প্রায় সমগ্র মুসলিম দেশে রফউল ইয়াদাঈন করা হয়। ইমাম বোখারী ও তকিউদ্দিন সুবকী (রহ) এর সাক্ষ্য–

ومن اهل المكة والمدينة والحجار الشام واليمن
والعراق والبصرة ومن اهل الخراسان انهم كانوا
يرفعون ايديهم عند الكركوع والرفع الرأس منه.

অর্থাৎ ঃ- মক্কা, মদীনা হিযাজ, ইয়ামান শাম শিরীয়া, ইরাক, বসরা, ও খোরাসানের বাসিন্দাগণ সবাই রুকুতে যাওয়ার সময় এবং রুকু থেকে মাথা উঠানোর সময় রফউল ইয়াদাঈন করতেন।(দেখুন যুয বোখারী ৭ পৃষ্ঠা। বায়হাকী ২য় ৭৫ পৃষ্ঠা)। ইমাম আবু নছর মারওয়াজী বলেন –

لا نعرف مصرا من الامصار .... (الخ)

অর্থাৎ আমি এমন কোন শহরের কথা জানি না যে তারা নামাযে রফউল ইয়াদাঈন করে না, একমাত্র কুফার বাসিন্দা ব্যতীত। (নাইলুল আওতার ১মঃ ১৫০ পৃঃ)।

অতএব রফউল ইয়াদাঈন রাসুল (সঃ) এর জীবন্ত সুন্নাত। এটা ছাড়া নামায অসম্পূর্ণ থাকবে। ২৩

*২৩ বিশ্বনবী (সঃ) এর নামাযই হানাফী মাযহাবের নামায নামক বই এর লেখক লিখেছেন, রুকুতে যাওয়া এবং রুকু থেকে উঠার সময় রফউল ইয়াদাঈন করা নাকি বিশ্বনবী (সঃ) এর পদ্ধতি নয়। এ ব্যাপারে তিনি যে দলিল পেশ করেছেন তার সার সংক্ষেপ। **প্রথমে** তিনি সুরা মু'মিনের২ নং আয়াত কোরআন থেকে দলিল দেখানোর জন্য এনেছেন।*

والذينهم فی صلاتهم خاشعون

অর্থাৎ যারা বিনয়ী নম্র নিজেদের নামাযে। (সূরা মুমিনুন আয়াত ২)। খুশুর আভিধানিক অর্থ স্থিরতা। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসিরে মারেফুল কোরআনে বলা হয়েছে, অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ধীর স্থিরতা থাকা। নামাযে অনার্থক নড়াচড়া না করা, এমন নড়াচড়া যা রাসুল (সঃ) করতে নিষেধ করেছেন। যেমন ঃ দেহের কোন অংশ নিয়ে খেলা করা। এক ব্যক্তি নামাযে তার দাড়ি নিয়ে খেলা করতে দেখে রাসুল (সঃ) বললেন এই ব্যক্তির অন্তরে খুশু খুজু থাকলে নামাযে তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ স্থির থাকত। (তাফসীরে মাযহারী) এ আয়াত নাজিল হওয়ার পর সাহাবীরা নামাযে নজর সেজদার দিকে রাখতেন। তফসিরে ইবনে আব্বাসের উদ্বৃতি দিয়ে মুফতী ওয়াক্কাস আলী সাহেব আয়াতটি এনে নামাযে রফউল ইয়াদাইন না করার দলিল আবিষ্কার করেছেন। অথচ এ আয়াত নাযিল হয়েছে নামাযে খুশু খুজু বিনয় নম্র হওয়ার জন্য। আয়াতটির ব্যাখ্যায় ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেণ, "বিনয়ী ও অনুগত: ডানে বামে তাকায় না এবং নামাযের মধ্যে উপরের দিকে হাত উত্তোলন করে না। সাহাবীরা প্রথমে নামাযে ডানে বামে তাকাতেন। অনেক সময় নামায রত অবস্থায় আসমানের দিকে তাকাতেন। হাত ও আসমানের দিকে উঠাতেন। যার কারণে নামাযে খুশু খুজু নষ্ট হতো। যার পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত নাযিল করা হয়েছে। নামাযে রউফল ইয়াদাইন মনসুখ হওয়ার জন্য নয়। রউফল ইয়াদাইন তো রাসুল (সঃ) এর জীবন্ত সুন্নাত যা তিনি মৃত্যুর আগ পর্যন্ত করেছেন। (বায়হাকী) যার সমর্থনে ৪ শত হাদীস ও আসার বর্ণিত হয়েছে। সেটা কেন মনসুখ হবে?

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ, এ আয়াত দিয়ে রফউল ইয়াদাইন মনসুখ হলে- মুফতী ওয়াক্কাস আলী সাহেব নামাযে তাকবীরে তাহরিমার সময় যে রউফল ইয়াদাইন (দুই হাত উত্তোলন) করেন। দুই ঈদের সময় যে ৬ বার রফউল ইয়াদাইন করেন। বেতের নামাযের সময় যে রফউল ইয়াদাইন করেন। তা সবই যে পন্ড হয়ে যায়, তা কিন্তু তিনি ভাবেননি। তারপর তার দৃষ্টিতে ৪ মাযহাব যে হক্কের উপর প্রতিষ্ঠিত আছে। সেই ৪ মাযহাবের শাফেয়ী, মালেকী হাম্বলী মাযহাবের অনুসারীগণ নামাযে রুকুতে যাওয়ার সময় এবং রুকু থেকে ওঠার সময় যে রফউল ইয়াদাইন করেন (তিরমিযী) তা সবাই যে না হক্ক ভাবে মনসুখ হাদীসের উপর আমলকারী বলে প্রশ্নের সম্মুখিন হতে হয় তাও মনে হয় তিনি ভাবেননি। অবশ্যই এ আয়াত নামাযে খুশুখুজু বিনয় নম্র হওয়ার জন্য নাযিল হয়েছে রফউল ইয়াদাইন মনসুখ হওয়ার জন্য নয়। এটা হচ্ছে রফউল ইয়াদাইন না করার কোন সহীহ দলিল না থাকায় কোরআন থেকে দলিল আবিষ্কার করার জঘন্য অপচেষ্টা যা আজ পর্যন্ত কোন মুফতী মুফাসসির এ আয়াত দিয়ে রফউল ইয়াদাইন মনসুখ হওয়ার দলিল বানানোর ধৃষ্টতা দেখাননি।

***দ্বিতীয় দলিল** হিসাবে এনেছেন মুসলিম শরীফের একটি হাদীস। হাদীসটি জাবের বিন ছামুরা (রা) থেকে বর্ণিত–*

রাসুল (সঃ) বললেন কি ব্যাপার আমি তোমাদের কে জংলী ঘোড়ার লেজের মত হাত উঠাতে দেখেছি? নামাযে স্বস্থির থাক। (মুসলিম ১মঃ ১৮১ পৃষ্ঠা)।

এ হাদীস সম্পর্কে আমিরুল মু'মিনিন ফিল হাদীস ইমাম বোখারী (রহ) বলেন,- যে, ব্যক্তি জ্ঞানের সামান্য ছোঁয়া পেয়েছে সেও এই হাদীস দ্বারা রফউল ইয়াদাঈন বর্জনের দলিল নেবেনা। এটা পরিষ্কার ও প্রসিদ্ধ বিষয় এতে কোন মতানৈক্য নেই। (যুয বোখারী ১৫ পৃষ্ঠা)। এ হাদীস মুজমাল বা

সংক্ষিপ্ত। এখানে হাত উঠানোর স্থানের কথা বলা হয় নাই। এই হাদীসের বিস্তারিত বর্ণনা যা মুসলিম শরীফে এসেছে, তা হলো সালাম ফেরানোর সময় হাত উঠান নিষেধ করা হয়েছে।
পাঠকগণ, শুধু মুসলিম নয়, যত হাদীসের গ্রন্থে হাদীসটি আনা হয়েছে সবই দেখুন সালামের অনুচ্ছেদে এনেছেন, তাই উক্ত হাদীসের সম্পর্ক যে সালামের সঙ্গে তা স্পষ্ট হয়ে রয়েছে।
সাহাবীগণ সালামের সময় যে হাত উঠিয়ে ইশারা করতেন ঐ হাদীসের পরবর্তি হাদীসে তা প্রকাশ পেয়েছে। সেখানে আছে قلنا السلام عليكم .... الى الجانبين
অর্থাৎ ঃ- যাবের বিন মাসুরা (রাঃ) বলেন, আমরা নামাযে যখন সালাম ফিরাতাম তখন দুই দিকে হাত উঠিযে ইশারা করতাম-এভাবে (তিনি দুই দিকে দুই হাত উঠিয়ে ইশারা করে দেখালেন) দেখুন মুসলিম ১মঃ ১৮১ পৃঃ। আর যদি তর্কের খাতিরে কিছুক্ষণের জন্য মেনে নেই যে এটা নামাযে রফউল ইয়াদাঈন (দুই হাত উত্তোলন) সম্পর্কে তাহলে নামাযের শুরুতে, দুই ঈদে অতিরিক্ত তাকবির বলে হাত উঠান বেতের নামাযে দোয়া কুনুতের সময় হাত উঠান এবং শাফেরী মালেকী, হাম্বলী মাযহাবের লোকেরা সবই নামাযে নিষিদ্ধ পদ্ধতি অবলম্বন করে গোমরাহ ফেরকার ও অন্তর্ভূক্ত হয়ে যায়। আর কেবল ওদের মাযহার বিশূদ্ধ ও দুধে ধোয়া হয়ে যায়। তাই এ হাদীস যে কস্মিন কালেও রফউল ইয়াদাঈন সম্পর্কে নয় তা নিতান্ত নির্বোধ বা জ্ঞান পাপী ব্যতিত সকল হাদীস পাঠকগণ জানেন যে এ হাদীস শুধু সালামের ব্যাপারে। তাই বলছিলাম এ দেশে শাফেয়ী মাযহাবের লোক নেই বলে রেহাই পেয়ে গেলেন, নইলে এর জবাব কত কঠিন ভাবে নিতে হত তখন বুঝতেন।
তারপর উনি লিখেছেন জাবের বিন সামুরা (রা) এর হাদীস শুধু সালামের অনুচ্ছেদের হাদীস বলে দাবী করা নাকি বোকার স্বর্গে বাস করা।
পাঠকগণ, জাবের বিন সামুরা (রা) এর হাদীস সালামের অনুচ্ছেদে আমরা তো আনিনি? এনেছেন হাদীস সম্রাট ইমাম বোখারী, ইমাম মুসলিম, ইমাম আবু দাউদ, ইমাম দারাকুতনী প্রথম শীর্ষস্থানীয় হাদীস বিশারদগণ। তাহলে তার কথা অনুযায়ী হাদীস সম্রাটগণ সবাই কি বোকার স্বর্গে বাস করেন? নাউজুবিল্লাহ।
পাঠকগণ উপরোক্ত শীর্ষ স্থানীয় হাদীস সংকলক যারা না জন্মালে আমরা সহীহ হাদীসের অভাবে পথভ্রান্ত হতাম সেই হাদীস বিশেষজ্ঞগণের চেয়ে যদি মুফতী অয়াক্কাস আলী সাহেব বেশি বোঝেন বলে দাবী করেন তাহলে প্রকৃত বোকার স্বর্গে কে বাস করেন তা পাঠকগণই বিবেচনা করুন।
এরপর **তৃতীয় দলিল** হিসাবে এনেছেন ইবনে মাসউদ (রা) থেকে একটি হাদীস, যেখানে তিনি বলেছেন, আমি কি তোমাদের রাসুল (সঃ) এর নামায পড়িয়ে দেখাব না? তিনি নামাযে তাকবিরে তাহরিমার সময় শুধু একবার রফউল ইয়াদাইন করলেন। (দেখুন তিরমিযী ১ম ২৭ পৃষ্ঠা)। ইমাম তিরমিযী একটু উপরে ইবনে ওমর থেকে রুকুর সময় রফউল ইয়াদাঈন করার হাদীসটি এনেছেন এবং বলেছেন এ হাদীস সহীহ। পরে ইবনে মাসউদের বর্ণিত হাদীসটি

لم يرفع الا فى اول مرة

(প্রথম একবার ছাড়া হাত উঠানেল না) আনার পর ইমাম তিরমিযী ইবনে মোবারকের উদ্ধৃতির মাধ্যমে প্রথমে ইবনে মাসউদের হাদীস অপ্রমাণিত বলেছেন। এবং পরে ঐ হাদীসকেই হাসান বলেছেন এ দুই কথার মধ্যে কোন বিরোধ নেই। হাদীসটির মতন অরক্ষিত, সনদ হাসান। এ হাদীসের মতন অরক্ষিত যা ইমাম বোখারী, ইমাম আবু দাউদ ও অন্যরা বলেছেন তা সামনে আসছে।
পাঠকগণ ইবনে মাসউদ (রা) এর হাদীসের মধ্যে রুকুর কথা উল্লেখ নেই। তাই এ হাদীস থেকে যা বোঝা যায় তা হল (১) তাকবীরে তাহরিমার সময় শুধু একবার হাত উঠাতে হবে বারবার নয়।

তাই মেশকাতের ইবারাত এভাবে এসেছে-

لم يرفع يديه الا مرة واحدة مع تكبيرة الافتتاح

অর্থাৎ ঃ- তিনি তাকবীর তাহরিমার সময় শুধু এক বার হাত উঁচু করেছিলেন (বার বার নয়) দেখুন মেশকাত।
(২) আল কামার এই বাক্য- ইবনে মাসউদ প্রথম বার ছাড়া হাত উঠাননি এটা ইবনে মাসউদের ক্ষেত্র বিশেষে তার উল্লেখ না করাটা বিষয়টার অস্তিত্বহীনতা বোঝায় না কেননা এর মোকাবেলায় অসংখ্য সাহাবী থেকে রফউল ইয়াদাঈনের সহীহ বর্ণনা আছে। এ কারণে এ হাদীসটি দাবীর পক্ষে যথেষ্ট নয়।
হতে পারে ইবনে মাসউদ (রাঃ) রফউল ইয়াদাঈন সুন্নাত জেনেও ভুলে গিয়ে ছিলেন। অথবা এটাও হতে পারে তিনি সুন্নাত হওয়াটাও ভুলে গিয়েছিলেন। যেমন- এক ব্যক্তি হযরত ওমর (রা) এর নিকট এসে বললেন, আমি নাপাক হয়েছি পানি পায়নি এখন আমি কি করব? তিনি বললেন নামায পড়তে হবে না। তখন আম্মার (রাঃ) বললেন- আমীরুল মু'মিন- আপনার কি স্মরণ নেই? যে এক অভিযানে আমিও আপনি উভয়ই অপবিত্র হয়ে পড়লাম, পানি পেলাম না। আপনি নামায পড়লেন না আর আমি মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে নামায পড়লাম। রাসুল (সঃ) কে এ ঘটনা অবগত করালে তিনি বললেন, তোমাদের জন্য এটাই যথেষ্ট ছিল যে, তোমরা উভয় হাত মাটিতে মারতে, তারপর ঝেড়ে ফেলে তা দিয়ে মুখ মন্ডল ও উভয় হাতের কব্জি পর্যন্ত মসাহ করতে। (মুসলিম দ্বিতীয় খন্ড তায়াম্মুমের অনুচ্ছেদে)। অতএব সাহাবীগণ অনেক ক্ষেত্রে অনেক বিষয় স্মরণ না থাকায় ভুলে যেতেন পরেক্ষণে আবার তা ঠিক করে নিতেন এমন ঘটনা অনেক রয়েছে।
(৩) এই হাদীসের মতন সুরক্ষিত নয়। সহীহ মতন এভাবে

قال عبد الله علمنا رسول الله ﷺ صلاة فكبر ورفع يديه ثم طبق --- (الخ)

قال البخارى (رح) وهو محفوظ عند اهل النظر من حديث عبد الله بن مسعود (رض)

অর্থাৎ - ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসুল (স) আমাদের নামায শিখালেন, তিনি নামাযে দাড়ালেন তাকবির বললেন ও রফউল ইয়াদাঈন করলেন অতঃপর রুকু করলেন এবং হাত অনুরূপ করলেন শেষ পর্যন্ত। (আবু দাউদ নাসাই বায়হাকী)। ইমাম বোখারী (রা) বলেন হাদীস বিশেষজ্ঞদের মতে ইবনে মাসউদ বর্ণিত হাদীসের এই মতনই সুরক্ষিত। (দেখুন যুয্ রফউল ইয়াদাইন বোখারী ১৪ পৃঃ)। তাই ইমাম আবু দাউদ ইবনে মাসউদ (রা) এর শুধু মাত্র প্রথমবার হাত তোলা সম্পর্কিত হাদীসটি সম্পর্কে লিখেছেন।

ليس هو بصيح على اللفظ على هذا المعنى

অর্থাৎ ঃ- এই শব্দেও অর্থে হাদীসটি সহীহ নয়। (দেখুন-আবু দাউদ ১মঃ ১১৬ পৃঃ)। এ কারণে আব্দুল্লাহ বিন মুবারক, ইমাম শাফেয়ী ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল, ইমাম ইয়াহইয়া, ইমাম দারাকুতনী, ইমাম বায়হাকী, ইমাম আবু হাতেম, ইমাম হাকেম, ইমাম বোখারী, প্রভৃতি ইমামগণের মতে ঐ হাদীস শব্দ সম্ভারে সঠিক অর্থে উত্তীর্ণ হতে পারে নাই। (তাসহিলুল কারী।) ইমাম ইবনে হিব্বান এ পর্যন্ত ও লিখেছেন, ان له علال تبطله এ হাদীসের মধ্যে এমন অনেক ত্রুটি রয়েছে, যা হাদীসটিকে বাতিল সাব্যস্ত করে। (নাইলুল আওতার ২য়ঃ ১৫১ পৃষ্ঠা)।
(৪) আর-যদি এই হাদীস সহীহ হিসাবে মেনে নেওয়া হয়, তাহলে ইবনে মাসউদ (রা) এর

নামাযের মধ্যে আরও যে সব ভুল হয়েছে সেটাও মেনে নিতে হয়।
যেমন– রুকুতে তিনি দুই হাটুর মধ্যে হাত ঢুকায়ে রাখতেন হাটুর উপর রাখতে নিষেধ করতেন। (২) তিনজন লোকের জামাতে ইমামের ডাইনেও বামে মুক্তাদী হিসাবে তিনি দাঁড় করাতেন (৩) রুকুতে কব্জি হাটুতে বিছিয়ে দিতেন। (মুসলিম)। (ইবনে মাসউদ (রা) এর এসব আমল সাহাবায়ে কেরামদের বিশাল দলের বর্ণিত হাদীসের বিপরীত বলে প্রমাণিত হয়েছে। তাই এ দলিল রফউল ইয়াদাঈনের বিপক্ষে গ্রহণযোগ্য নয়।

চতুর্থ নং দলিল–

বারাবিন আযের হতে বর্ণিত তিনি বলেন– আমি রাসুল (সঃ) কে নামাযের শুরুতে হাত উঠাতে দেখেছি এর পর আর উঠাননি। (মুসনাদে ইমাম আযম আবু দাউদ-১১৬ পৃষ্ঠা)।
এই হাদীসেও রুকুর কথা উল্লেখ নেই। এর পরও এ হাদীস থেকে যা প্রমাণ হয় তা হল, শুধু নামাযের শুরুতেই একবার রফউল ইয়াদাঈন করতে হবে বার বার নয়। আর এটাই হচ্ছে এই হাদীসের সঠিক অর্থ। রফউল ইয়াদাইন না করার ভিত্তি হচ্ছে ثم لا يعد শব্দের উপর। কিন্তু আসল কথা হচ্ছে এটা বারাবিন আযেবের বর্ণিত শব্দ নয়। এই হাদীসে ইয়াযিদ বিন আবিযযিয়াদ নামে একজন বর্ণনাকারী আছেন, আলোচ্য শব্দ টি তার। আর ইয়াযিদ এ হাদীস দুভাবে বর্ণনা করেছেন। (১) রাসুল (সাঃ) নামাযের শুরুতে হাত উঠাতেন (২) রাসুল (সঃ) নামাযের শুরুতে রুকুর পূর্বে ও পরে হাত উঠাতেন। (বায়হাকী ২য় খঃ ২৭ পৃষ্ঠা)। তিনি যখন কুফার ভিতরে থাকতেন তখন এক রকম আর যখন কুফার বাহিরে থাকতেন তখন আর এক রকম বলতেন।(দেখুন আবু দাউদ ১ম ঃ ১১৬ পৃষ্ঠা)। তিনি এ হাদীস কখনও সংক্ষিপ্ত ভাবে কখনও লম্বা করে বর্ণনা করেছেন। বেশ কিছুদিন তিনি উক্ত শব্দে সংক্ষিপ্ত ভাবে হাদীসটি বর্ণনা করেন; পরে যখন তিনি বৃদ্ধ হয়ে যান তখন কারবালায় হোসেনের হত্যাকারী ও সুন্নাতের শত্রু কুফাবাসী তাকে ثم لا يعد-- শব্দ বৃদ্ধি করতে শিখিয়ে দিয়েছিলেন। ফলে তিনি ثم لا يعد বৃদ্ধি করে বলতে লাগলেন। (দেখুন নাইলুল আওতার ২য় খঃ ১৫১ পৃষ্ঠা)। ঐ হাদীস আলী বিন আসিমের সামনে উনি একদিন বর্ণনা করার সময় যখন ثم لا يعد বলেন নি তখন আলী বিন আসিম বলেন, আপনিতো ثم لا يعد বলেন? এবার তিনি বললেন, আমার মনে নেই। (দেখুন দারা কুতনী)। জাবের বিন সামুরা বলেন,- হযরত ওমর কুফার গভার্ণর সা'দ (রা) কে ডেকে বললেন–, لقد شكوك فى كل شى..... (الخ)- অর্থাৎ ঃ- কুফাবাসীরা নানা বিষয়ে তোমার উপর অভিযোগ করছে– এমন কি নামাযের ব্যাপারেও। সা'দ বললেন; আমি নামাযে প্রথম রাকাত লম্বা করি এবং শেষের রাকাত সংক্ষিপ্ত করি, এবং আমি নামাযের মধ্যে রাসুল (সঃ) এর অনুসরণে কোন রকম কমতি করি না, হযরত ওমর (রা) বললেন তুমি সত্য বলেছ, তোমার উপর আমার ধারনা এমনই ছিল। (বোখারী) ।এ হাদীসে বোঝা যায় কুফাবাসীগণ সুন্নাত মোতাবেক নামায আদায় করত না বরং সাহাবাগণকেও বাধ্য করতো যেন তারাও তাদের মত হয়ে সুন্নাতের বিপরীত নামায আদায় করে। এমনকি তারা গভর্নরদের উপর চাপ সৃষ্টি করতো যে তারাও যেন তাদের মত হয়ে যায়। সুফিয়ান বলেন;;

حدثنا يزيد بن ابى زياد بكمة-----(الخ)

অর্থাৎ ঃ- ইয়াযিদ বিন আবি যিয়াদ মক্কায় আব্দুর রহমান এবং বারা (রা) এর মাধ্যমে বর্ণনা করেন যে, রাসুল (সঃ) নামাযের শুরুতে হাত উঠাতেন এবং যখন রুকু করতেন, তখন, আবার রুকু থেকে মাথা উঠিয়েও হাত উঠাতেন। অতঃপর আমি একবার কুফায় গেলাম তখন আমি ইয়াযিদকে ঐ হাদীস এভাবে বর্ণনা করতে শুনেছি যে, রাসুল (সঃ) নামাযের শুরুতে হাত উঠাতেন, এর পর

আর হাত উঠাতেন না। তখন আমি বুঝতে পারলাম যে কুফাবাসীগণ তাকে এভাবে শিখিয়ে দিয়েছেন। (দেখুন বায়হাকী ২য় খঃ ৭৭ পৃষ্ঠা)। অতএব বারা বিন আযেব থেকে রফউল ইয়াদাইন না করার হাদীস বাতিল। এ তিন জন সাহাবী ছাড়াও লেখক আরও কিছু দলিল এনেছেন ঐ সমস্ত সাহাবী হতে যারা রফউল ইয়াদাইনের হাদীস বর্ণনাকারী ৫০ জন সাহাবীর মধ্যে অন্যতম বর্ণনাকারী সাহাবী। যেমন ঃ হয়রত ওমর ফারুক, ইবনে ওমর, আলী বিন আবুতালেব, ইবনে আব্বাস, ইবনে জুবায়ের(রাঃ) প্রমুখ, তা সবই ও বানাওয়াট বাতিল হাদীস।বিস্তারিত জবাব পাবেন আমার লেখা "নামাযে শুধুমাত্র তাকবীরে তাহারিমার সময় রফউল ইয়াদাইন করিতে হইবে নামক লেখনীর জবাব ও রফউল ইয়াদাইন রাসূল (সঃ) এর জীবন্ত সুন্নাত তার সঠিক প্রমাণে ৮০টি দলিল। বইটি প্রকাশের পথে **(কোন সহৃদয় ব্যক্তি আমার এ কাজে সহযোগিতার হাত বাড়াতে চাইলে স্বাগত জানাব। বলা বাহুল্য এটা হচ্ছে প্রকৃত সদকায়ে যারিয়া। আমার মত নগন্য কে আল্লাহ লেখার যৎসামান্য তৌওফিক দিয়েছেন, আর যারা সহযোগিতা করবেন তাদেরকে ও আল্লাহ সহযোগিতা করার তৌফিক দিন। তাহলে উভয়েই আমরা এ কাজে সমান অংশীদার হবো।)** আর বাতিল এ কথা শুধু আমি বলি নাই ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দীস মোল্লাআলী কারীম(হানাফী) (রহঃ) এর মুখে শুনুন-তিনি লিখেছেন,

منع رفع اليدين فى الصلاة عند الركوع والرفع منه كلها باطل لا يصح شئ كحديث ابن مسعود (رض)

অর্থাৎ নামাযে রুকুতে যাওয়ার সময় এবং রুকু হতে উঠার সময় দু'হাত উত্তোলন না করা সম্পর্কে যে সব হাদীস বর্ণিত হয়েছে সেগুলো সবই বাতিল হাদীস।" যেমন ইবনে মাসউদের হাদীস। (দেখুন মাওযুয়াতে কাবীর ১১০ পৃষ্ঠা)।
এই হচ্ছে বিশ্বনবী (সঃ) এর নামাযই হানাফী মাযহাবের নামায নামক বইএর দলিলের অবস্থা। ও বই এর পদ্ধতি যদি বিশ্বনবীর হয় তাহলে বোখারী মুসলিমের সহীহ হাদীস ভিত্তিক পদ্ধতি গুলি কোন বিশ্বনবীর হবে? পাঠকগণ, ইসলামের যারা হিতাকাঙ্খী নন তারা সুন্নাত বিকৃত করার জন্য জোর প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। তারা কেবল সহীহ হাদীসের মতন বিকৃত করে ক্ষান্ত হননি বরং সহীহ হাদীসকে অপ্রাসাঙ্গিক ভাবে ভিন্ন স্থানে ও উপস্থাপন করেছেন। যেমন- (১) মোনাফিকরা বগলে পুতুল রেখে নামাযে দাঁড়াত, তাই ফেলানোর জন্য, রাসুল (সঃ) রফউল ইয়াদাঈন (দুই হাত উত্তোলন) করতেন। এ মনগড়া উক্তির কোন অস্তিত্বই হাদীসের পাতায় নেই। অথচ জাহেলদের মুখে মুখে চলেই আসছে। (২) ইবনে যুবায়ের বলেন, রাসুল (সঃ) প্রথম যুগে এটা করতেন পরে ছেড়ে দিয়েছিলেন ইত্যাদি। অনেক কথা তৈরী করে বলা হয় যার কোন ভিত্তি নেই।
অতএব রফউল ইয়াদাঈন না করার কোন মযবুত দলিল নেই তাই রফউল ইয়াদাঈন না করা কখনও বিশ্বনবী (সঃ) এর নামাযের পদ্ধতি নয়। নামাযে রফউল ইয়াদাঈন করতে হবে এটাই সহীহ হাদীস ভিত্তিক তথা বিশ্বনবী (সঃ) এর নামাযের পদ্ধতি। এবার দেখুন হানাফী ফেকাহ হতে নামাযে রফউল ইয়াদাঈন করার জ্বলন্ত প্রমাণ । রফউল ইয়াদাঈনের হাদীস প্রমাণিত। (ফেকাহ নুরুন হেদায়া ১০৪ পৃষ্ঠা।) রাসুল (সঃ) মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত নামাযে রফউল ইয়াদাঈন করেছেন। (দেখুন ফেকাহ আইনুল হেদায়া ১ম ৩৮৬ পৃষ্ঠা)। রফউল ইয়াদাঈন রাসুল (সঃ) থেকে প্রমানিত এবং এটাই হক্ক। (আইনুল হেদায়া ১মঃ ৩৮৬ পৃষ্ঠা)।
এছাড়াও হানাফী মাযহাবের যাঁরা বড় বড় মুহাদ্দিস ছিলেন তারাও রফউল ইয়াদাঈন করার পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেছেন এদের ভিতরে একজন হচ্ছেন-আল্লামা আব্দুল হাই লাখনভী (রাহঃ) তিনি তার তালিকুল মুমাজ্জাদ নামক গ্রন্থে লিখেছেন, রাসুল (সঃ) থেকে রফউল ইয়াদাঈন করার বহু প্রমাণ রয়েছে। এবং এটাই প্রাধান্য যোগ্য। (তালিকুল মুমাজ্জাদ ১মঃ ১৪৬ পৃষ্ঠা)।

অতএব এটা দিবালোকের মত স্পষ্ট যে, রফউল ইয়াদাঈন রাসুল (সঃ) এর জীবন্ত সুন্নাত যা তিনি মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত করেছেন। হে আল্লাহ আমাদের সব ভাইকে এই গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাতের উপর আমল করার তৌফিক দিন আমীন।

রুকু করা

কেরাত শেষে একটু বিরতি দিয়ে হাতদুটি কাঁধ অথবা কান পর্যন্ত উঠিয়ে মহান প্রভু আল্লাহর সম্মুখে সসম্মানে মাথা ও পিঠ ঝুকিয়ে রুকুতে যেতে হবে। রুকুর সময় দুই হাতের আঙ্গুল খোলা রেখে। (হাকেম, বুলুগুল মারাম ৭৯ পৃঃ)। দুই হাটুর উপর ভর দিয়ে দোয়া পড়তে হবে এবং পিঠ ও মাথা সোজাও সমান্তরাল থাকবে। (বোখারী, মুসলিম, মেশকাত ৭৫ পৃষ্ঠা)। হাটু ও কনুই সোজা থাকবে। কোমর ও পিঠ বরাবর থাকবে। (মুসলিম, মেশকাত ৭৫ পৃষ্ঠা)। অতঃপর স্বস্তির হওয়ার পর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর মহত্ব ঘোষণা ও দোয়া অর্থ বুঝে পড়তে হবে। রুকু সেজদা খুব ধিরস্থির ভাবে করতে হবে। কারণ এ অবস্থায় বান্দার কৃতপাপরাশি ঝরতে থাকে। রুকু সেজদার জন্য হাদীসে অনেক গুলি দোয়া আছে। তার মধ্যে রুকুর জন্য سبحان ربى العظيم সুব্হানা রব্বিয়াল আজিম অর্থাৎ - মহা পবিত্র আমার প্রতিপালক যিনি মহান। এবং সেজদার জন্য - سبحان ربى الاعلى সুবহানা রাব্বিয়াল আলা । অর্থাৎঃ মহা পবিত্র আমার প্রতিপালক যিনি সর্বোচ্চ ।(তিরমিযী, আবুদাউদ, মেশকাত ৮৩ পৃঃ) । এগুলি সর্বাধিক প্রচলিত। কিন্তু শেষ জীবনে এসে রাসুল (সঃ) রুকু ও সেজদায় অধিকাংশ সময় এই দোয়া পড়তেন-

سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفرلى

সুবহানাকা আল্লাহুম্মা রব্বানা-ওয়াবিহামদিকা আল্লাহুম্মাগ ফিরলী।
অর্থাৎ ঃ- হে আল্লাহ আপনার প্রশংসার সাথে আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করছি। হে আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করে দিন। (বোখারী, মুসলিম, মেশকাত ২১ পৃষ্ঠা)।

রুকু সেজদায় চুরি ও তার শাস্তি

রাসুল (সঃ) বলেন মানুষের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট চোর ঐ ব্যক্তি যে তার নামাযে চুরি করে। সাহাবীরা (আশ্চার্য্য হয়ে) বললেন, সে কিভাবে নামাযে চুরি করে। রাসুল (সঃ) বললেন ও ব্যক্তি রুকু সেজদা পূর্ণভাবে করে না। (আহমাদ, মেশকাত ৮৩ পৃষ্ঠা)।

একদা সাহাবী হুযায়ফা (রা) একজনকে রুকু সেজদা পুরো না করতে দেখে অর্থাৎ ধীরস্থির ভাবে রুকু সেজদা না করে দ্রুত রুকু সেজদা করতে দেখে যেমন-আমাদের কিছু ভাইরা করেন। নামায শেষে তাকে ডাকলেন, অতঃপর বললেন, তুমিতো নামায় আদায় করনি? আমার মনে হয় তুমি যদি এ অবস্থায় মারা যাও তাহলে তুমি ঐ ধর্মের ওপর মরবে না যে ধর্মে মুহাম্মাদ (সঃ) রয়েছেন। (বোখারী, মেশকাত ৮৩ পৃষ্ঠা)। ইমাম আহমদ বিন হাম্বল বলেন (যিনি ১০লক্ষ হাদীসের হাফেজ) । রাসূল (সঃ) বলেছেন এমন একটা যুগ আসবে কারুর নামায আল্লাহর দরবারে কবুল হবে না। তিনি বলেন, আমি বাগদাদে এক শত মসজিদে নামায আদায় করেছি কিন্তু কারুর নামায আল্লাহর রাসূল (সঃ) এর সুন্নাত অনুযায়ী দেখি নাই।

পাঠকগণ, নামায হচ্ছে জান্নাত জাহান্নামের প্রথম পর্ব এই জন্য নামাযের আরকান সমূহের দিকে খেয়াল রাখা অত্যন্ত জরুরী। বিশেষ করে রুকু সেজদায় ধীর স্থিরতার দিকে খেয়াল রাখতে হবে কারণ হাদীসে এসেছে বান্দা যখন নামাযে ধীর স্থিরতা অবলম্বন করে সুন্দর ভাবে তা আদায় করে তখন সেটা চমকাতে চমকাতে উপরের দিকে ওঠে যায় যখন আসমানের দরজা পর্যন্ত পৌছে তখন আসমানের দরজা খুলে দেওয়া হয় এবং সে নামায নাম-াযীর জন্য দোয়া করতে করতে বলতে থাকে যে আল্লাহ তোকে হেফাজাত করুক ঐ ভাবে যে ভাবে তুই আমাকে হেফাজাত করেছিস। আর বান্দা যখন নামায খারাপ করে পড়ে বিশেষ করে রুকু সেজদায় ধীর স্থিরতা অবলম্বন করে না (শুধু পড়ে আর ওঠে) তখন ঐ নামায উপরে উঠে যায় এবং নামাযীর জন্য বদ দোয়া করতে করতে বলতে থাকে যে তুই আমাকে যেভাবে বরবাদ করেছিস আল্লাহ তোকে ঐ ভাবে বরবাদ করুক এবং আসমানের দরজা যখন বন্ধ পায়। তখন ঐ নামায পুরানো কাপড়ের মত বোটা হয় এবং নামাযীর মুখে ছুড়ে মারা হয়। (তাবারানী, বাজ্জার, মাজমাউজ জাওয়ায়েদ)।

কাওমা

রুকু থেকে মাথা তুলে সোজা হয়ে দাঁড়ানোকে কাওমা বলে। রাসুল (সঃ) سمع الله لمن حمده (সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদা) অর্থাৎ ঃ- যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রশংসা করে আল্লাহ তা শুনে থাকেন। বলার পর রুকু থেকে মাথা তুলতেন এবং রফউল ইয়াদাঈন করতেন। (বোখারী, মেশকাত ৭৫ পৃষ্ঠা)। এবং পড়তেন

اللهم ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد

আল্লাহুম্মারাব্বানা অলাকাল হামদ মিল আস সামাওয়াতি ওয়া মিল আল্ আরজে ওয়া মিল আ মা সিতা মিন শায়ইম বা আদু।

অর্থাৎ ঃ- হে আমাদের প্রভু আল্লাহ তোমার জন্য সমস্ত প্রশংসা, তোমার প্রশংসায় আসমান জমিন পূর্ণ এর পর ও তুমি ইচ্ছা করলে আরও পরিপূর্ণ ও পরিব্যাপ্ত করতে পার ।(মুসলিম, মেশকাত ৮২ পৃঃ) ।

সেজদা

রুকু হতে উঠে কাওমার দোয়া শেষ করে আল্লাহু আকবার বলে আল্লাহর দরবারে সেজদায় লুটিয়ে পড়তে হবে। রাসুল (সঃ) সেজদায় যাওয়ার সময় প্রথমে দুই হাত মাটিতে রাখতেন (সহীহ ইবনে খুযায়মা দারা কুতনী, মুস্তাদরাকে হাকিম, মেশকাত হাঃ নং-৮৯৯) । (হাদীস টি সহীহ) ।২৪

২৪ সেজদায় যাওয়ার সময় আগে হাঁটু রাখার হাদীস সহীহ নয়। নাইনুল আওতার ৩য় ঃ ১১৬ পৃঃ। হাফেজ ইবনে হাযার আসকালানী (রহঃ) বলেন, অন্যান্য হাদীসের চেয়ে প্রথমে দু'হাত মাটিতে রাখার হাদীস বেশি সহীহ। কারণ সে হাদীসের সমর্থনে ইবনে ওমর (রাঃ) এর হাদীসটি পাওয়া যায়। তাকে ইবনে খুযায়মা সহীহ বলেছেন ।(দেখুন বুলুগুল মারাম ৮১ পৃষ্ঠা) ।

তারপর হাঁটু রাখতেন। তিনি দু'হাতের তালু মাটিতে বিছিয়ে রাখতেন। (আবু দাউদ; ইবনে মাযা, রায়হাকী, মেশকাত হাঃ নং-৯০৫) । হাত দুটি কান অথবা কাঁধ বরাবর রাখতেন। নাক ও কপাল মাটিতে রাখতেন। (আবু দাউদ, তিরমিযী)। রাসুল (সঃ) বলেন, যে ব্যক্তি তার নাক মাটিতে রাখেনা তার নামায হয় না ।(দারাকুতনী তারারানী)। তিনি দু'পায়ের গোড়ালী একত্রে মিলিয়ে রাখতেন। (সহীহ ইবনে খুযায়মা)। দু'পায়ের আঙ্গুল গুলি ভাঁজ করে নরম ভাবে কেবলামুখি করে রাখতেন। (বোখারী, আবু দাউদ, তিরমিযী)। রাসুল (সঃ) বলেছেন, আমি কপাল, (নাকসহ) দু হাতের তালু, দু হাঁটু, দু'পায়ের অগ্রভাগের উপর সেজদা করতে আর কাপড় ও চুল জড়িয়ে না রাখতে আদিষ্ট হয়েছি। (বোখারী, মুসলিম)। তাই উক্ত অঙ্গগুলি সেজদারত অবস্থায় মাটিতে রাখতে হবে নতুবা সেজদা হবে না। হাত দুটি (কব্জি হতে কনুই পর্যন্ত) বিছিয়ে রাখতেন না, বরং জমিন থেকে উপরে উঠিয়ে উরু থেকে পৃথক রাখতেন এবং জমিন থেকে তা এতো দুরে থাকত যে কোন বকরীর বাচ্চা ইচ্ছা করলে তার ভিতর দিয়ে অনায়াসে চলে যেতে পারত। (বোখারী, মুসলিম)। এভাবে আল্লাহ পাকের দরবারে মাথা নত করে ভিখারীর মত রুকু সেজদায় যতক্ষণ অবস্থান করে ততক্ষনই তার পাপ রাশি ঝরতে থাকে। মুসলিম শরিফের মধ্যে এসেছে। সেজদা অবস্থায় তার মাথার উপর দিয়ে রহমতের বাসাত বইতে থাকে। এভাবে গোলাম তার দোষ শিকার করে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা অবস্থায় মাথা নত করে ষষ্টাঙ্গে যতক্ষণ মাটির উপর প্রনত হয়ে থাকবে ততক্ষণ গোলামী ও মিনতি সমুদ্রে ডুবে রইবে, আর

শ্রষ্ঠা পালন কর্তা এবং নিয়ামত দাতা রহমানুর রহিমের রহমতের দয়ার সাগরে ততই ক্ষমা, দয়া ও রহমতের ঢেউ উঠতে থাকবে এবং বান্দার পাপরাশি ধৌত হয়ে যাবে। এটাই হল নামাযের মূল বিষয় বস্তু। রাসুল (সঃ) বলেছেন, বান্দা যখন সেজদায় লুটিয়ে পড়ে তখন আল্লাহ বান্দার সবচেয়ে নিকটবর্তী হয়ে যান। ২৫

২৫ জমিন হতে আসমান ৫ শত বৎসরের রাস্তা দুরত্ব বা ব্যবধান। তারপর প্রথম আসমান হতে ২য় আসমান ৫ শত বৎসরের দূরত্ব বা ব্যবধান। এ রকম ব্যবধান সাত আসমানের। তার উপর বিশাল দরিয়া রয়েছে যার গভীরতা ৫ শত বৎসরের দুরত্ব। ঐ দরিয়ার উপর ৪জন ফেরেশতা, যাদের কাঁধ হতে কানের দুরত্ব দ্রুতগামী পাখির একশত বৎসর উড়ার দুরত্বের ব্যবধান। সেই ফেরেশতার কাঁধে রয়েছে মহান প্রভুর আরশ, যিনি ওয়াহ দাহু লা শারীক। আর আরশের উপরে রয়েছেন রহমানুর রাহ-ীম। আল্লাহ বান্দা থেকে হাজার হাজার বৎসর পথের দুরত্বের উপরে অবস্থান করলেও বান্দা যখন সেজদায় লুটিয়ে পড়ে বলে সুবহা না রব্বিয়াল আলা। অর্থাৎ - সবার উপরে আমার প্রতিপালক আল্লাহ, তারই আমি গুণগান ও পবিত্রতা বর্ণনা করছি তখন দুরত্ব আর থাকে না, বান্দার তখন তিনি খুব কাছাকাছি হয়ে যান। তাই সেজদার দোয়া ছাড়া ও ঐ সময় কোরানের কোন আয়তা ছাড়া প্রয়োজনীয় অনেক কিছু তাঁর কাছে চাওয়া যায় ।

সেই জন্য তোমরা সেজদায় বেশী করে দোয়া পড়বে ।(মুসলিম, মেশকাত ৮৭ পৃষ্ঠা)। রুকু সেজদার দোয়া দেখুন রুকুর অনুচ্ছেদে। প্রথম সেজদা থেকে উঠে বাম পায়ের পাতার উপরে বসতে হবে ও ডান পায়ের পাতা খাড়া রাখতে হবে ।(বোখারী, আবু দাউদ, মেশকাত হাঃ নং-৭৯২)। এবং এই দোয়া পড়বে।

اللهم اغفرلى وارحمنى واهدنى وعافنى وارزقني

আল্লাহুম্মাগ ফিরলী অয়ার হামনি, ওয়াহদিনী, ওয়া-ফিনী, ওরযুখনী।

অর্থাৎ ঃ- হে আল্লাহ তুমি আমাকে ক্ষমা কর। আমার উপর দয়া কর। আমাকে সরল পথে পরিচালিত কর। আমাকে সুস্থতাদান কর। আমাকে রিযিক দান কর ।(আবু দাউদ তিরমিযী, মেশকাত ৮৪ পৃষ্ঠা)। অতঃপর দ্বিতীয় সেজদা করতে হবে। বিশ্বনবী (সঃ) এর নামাযই হানাফী মাযহাবের নামায নামক বই এর লেখক এই দোয়াটি পড়া সংক্রান্ত হাদীসটি তার বই এর মধ্যে এনেছেন- মানুষদের কে একটা ধোকা দেওয়ার জন্য। তারা কিন্তু সস্থির ভাবে বসেনও না, দোয়াটি পড়েন ও না, কাউকে পড়তে বলেন ও না, দুই সেজদা দিয়েই অমনি চট করে দাঁড়িয়ে যান। সহীহ হাদীসের অনুসারী মক্কা মদিনায় ও দুই সেজদার মাঝে বসে এই দোয়াটি পড়া হয়। ২৬

২৬ সেজদার সময় নারী পুরুষের কোন পার্থক্য সহীহ হাদীসে নেই, ওটা একই নিয়ম। কিন্তু হানাফী ফক্কীহগণ বলেন- মেয়েরা পুরুষের মত উরু ও পেটের মাঝে ফাঁক রাখবেনা। পেটটি দুই উরুর সঙ্গে লাগিয়ে দেবে (হেদায়া ১মঃ ১৪৭ পৃষ্ঠা)। প্রমাণ স্বরূপ তারা মারা সেলে আবু দাউদ ও বায়হাকী

থেকে একটি যঈফ হাদীস এনেছেন। বিশ্বনবী (সঃ) এর নামাযই হানাফী মাযহাবের নামায নামক বই এর লেখক ওই হাদীসটি তার বই এর ১১৯ পৃষ্ঠায় এনেছেন। হাদীসটি যে মোটেই সহীহ নয় তার প্রমাণ দিয়েছেন হাদীসের হাফেজুদ্দুনিয়া আল্লামা ইবনে হাযার আসকালানী (রহঃ) তিনি বলেন এ ব্যাপারে দু'টি হাদ্যীস রয়েছে তবে দুটোরই সূত্রে মাতরুক (পরিত্যক্ত) বর্ণনাকারী রয়েছে। (দেখুন তালখিছুল হাবির ৯১ পৃষ্ঠা)। অতএব, মহিলাদের সেজদা দেওয়ার যে পদ্ধতি প্রচলিত মাযহাবী নামাযে রয়েছে, ওটা কোন কালেও সহীহ নয়। সহীহ হাদীস হচ্ছে মহিলা ও পুরুষের নামায পদ্ধতিগত দিক একই। বিস্তারিত দেখুন আমার বই এর ১২ ও ১৩পৃঃ।

নামাযে বসার নিয়ম

৩ অথবা ৪ রাকাত বিশিষ্ট নামাযে ২ রাকাতের পর শুধু আত্তাহিয়্যাতুর বৈঠককে প্রথম বৈঠক বলে সেখানে রাসুল (সঃ) বাম পা বিছিয়ে দিয়ে তার উপর বসতেন ও ডান পা খাড়া করে কেবলা মুখি করে রাখতেন। (বোখারী, মুসলিম) এবং সকল নামাযের শেষ বৈঠক রাসুল (সঃ) বাম পা ডান পায়ের নলার নিচু দিয়ে বের করে দিতেন। এবং পাছার উপর ভর করে বসতেন।(আবু দাউদ, মেশকাত ৭৬ পৃষ্ঠা)। রাসুল (সঃ) উভয় বৈঠকে বাম হাতের আঙ্গুল গুলি মিলিত ভাবে বাম উরুর উপর কেবলামুখি করে রাখতেন। আর ডান হাতের বৃদ্ধ ও মধ্যমা আঙ্গুলের মাথা সংযোগ করে নিতেন বা কখনো শাহাদাত আঙ্গুল ছাড়া ৪টা আঙ্গুলকেই মুড়ে নিতেন এবং শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করতেন, ও কেবলা মুখী করে ডান উরুর উপর রাখতেন। (মুসনাদে আহমাদ) মক্কা মদীনায় ও নামাযে বসার পদ্ধতি উপর উল্লেখিত নিয়মে। ২৭

২৭ নামাযে নারী-পুরুষের বসা একই রকম। (বোখারী ১১৪ পৃঃ)। বোখারীর উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যার হানাফী মাযহারের সেরা পন্ডিত আল্লামা আইনী (রহঃ) বলেন, এই হাদীস প্রমান করে যে, মেয়েদের ও পুরুষের মত বসা মোস্তাহাব ও পছন্দনীয়। (দেখুন উমদাতুল কারী শরাহ্ বোখারী ৬ষ্ঠ ঃ ১০১ পৃষ্ঠা)। মেয়েদের বসা সম্পর্কে হানাফী ফকিগণ বলেন, মেয়েরা বাম পাছার উপর ভর দিয়ে বসবে এবং পা দুটো ডান দিক দিয়ে বের করে দিবে। কারণ এতে পর্দা হবে। (হেদায়া ১মঃ ৯৩ পৃষ্ঠা।) বিশ্বনবী (সঃ) এর নামাযই হানাফী মাযহারের নামায নামক বই এর লেখক তার বই এর ১১৫ পৃষ্ঠায় একই সুরে সুর মিলিয়ে প্রমান স্বরূপ একটি হাদীস এনেছেন মাজমাউজ যাওখায়েদ থেকে যে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) কে জিজ্ঞেস করা হল রাসুল (সঃ) এর যুগে মেয়েরা কোন পদ্ধতিতে নামায আদায় করত? উত্তরে তিনি বললেন, প্রথমে তারা আসন গেড়ে বসত, পরে তাদের নির্দেশ দেওয়া হল তারা যেন চেপে চেপে আটো সাটো হয়ে বসে। আসলে এ হাদীসটি ইবনে ওমরের নামে বানাওয়াট হাদীস। (দেখুন রেজাল মিজানল এতে দাল ১মঃ ৪৯৬ পৃষ্ঠা)। রেজাল-লেসানুল মিযান ৩য়ঃ ৩৪৮ পৃষ্ঠা)। অথচ উনি একটু চোখ ঘোরালে দেখতে পেতেন বুখারতিেই উম্মুদ দারদাহ(রাঃ) বলেন আমরা নামাযে পুরুষদের মতই বসতাম। (দেখুন বোখারী ১ম খঃ৩৫৫ পৃঃ। আবিশায়বা ২য় খঃ ১৮৩ পৃঃ)। মুলতান ছাপা। এই হল বিশ্বনবী (সঃ) এর নামাযই হানাফী মাযহাবের নামায নামক বই এর দলিলের অবস্থা। তাই ঐ পদ্ধতি কস্মিন কালেও বিশ্ব নবী (সঃ) এর পদ্ধতি নয়।

জলসায়ে ইস্তেরাহাত (স্বস্থির বৈঠক)

২য় ও ৪র্থ রাকাতের পর দাড়ানোর আগে সেজদা থেকে উঠে সামান্য সময়ের জন্য স্থির হয়ে বসা সুন্নাত। এটাকে জলসায়ে এস্তেরাহাত বা স্বস্থির বৈঠক বলে। মালেক বিন হুয়ায়রেস (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসুল (সঃ) যখন বেজোড় রাকাত গুলিতে পৌছাতেন তখন দাঁড়াতেন না যতক্ষণ স্বস্তির বৈঠক না করতেন। (বোখারী, মেশকাত ৯৬ পৃষ্ঠা)। এই বসা বেশিক্ষণ নয় সোজা হয়ে বসেই উঠে পড়তে হবে। রাসুল (সঃ) যখন দ্বিতীয় সেজদার পর মাথা উঠাতেন তখন জমিনের ভর দিতেন এবং তার পরেই উঠতেন। (বোখারী)। অন্য হাদীসে এসেছে যখন উঠতেন তখন জমিনের উপর হাত ভর দিতেন। (সহীহ ইবনে খুযায়মা। ১মঃ ৩৪২ পৃষ্ঠা)। ২৮

২৮ প্রচলিত মাযহাবী নামাযে জলসায়ে এস্তেরাহাত করা হয় না। বিশ্ব নবী (সঃ) এর নামাযই হানাফী মাযহারের নামায নামক বই এর লেখক ও করেন না। অথচ তাদের বরেণ্য ফেকাহ দুর্রে মুখতাবের প্রথম খন্ডের ৭৬ পৃষ্ঠায় লেখা হয়েছে ولو فعل لاباس যদি প্রথম এবং তৃতীয় রাকাতে একটু বসে এবং হাত লাগিয়ে উঠে তাহলে কোন অসুবিধা নেই। (১মঃ ৭৬ পৃষ্ঠা)। ফেকাহ শরাহ বেকায়ার ভিতরে লেখা হয়েছে-فان اعتمد فلا باس به كما فى المحيط অর্থাৎ নামাযে উঠার সময় যদি হাতে ভর করে উঠে তাহলে কোন অসুবিধা নেই। যেমন মুহিত গ্রন্থের ভিতরে এসেছে। জলসায়ে এস্তেরাহাত না করার কোন সহীহ হাদীস নেই। যা আছে তা যঈফ। আর সহীহ হাদীস হচ্ছে নামাযে জলসায়ে এস্তেরাহাত করা। (দেখুন-তিরমিযী ৬৮ পৃঃ।) ফেকাহ নূরুল হেদায়ার মধ্যে লেখা হয়েছে জলসায়ে এস্তেরাহাত নাকরার বর্ণনার মধ্যে ইবনে আয়াশা যঈফ। (দেখুন ফেকাহ নূরুল হেদায়া ১০১ পৃষ্ঠা)।

অতএব সহীহ হাদীস বিদ্যমান থাকতে যঈফ হাদীসের উপর আমল করা এবং সেটাকে বিশ্ববনী (সঃ) এর নামাযের পদ্ধতি বলা এটাকেই বলে মুফতী সাহেব প্রকৃত বোকার স্বর্গে বাস করা। বলা বাহুল্য মক্কা মদীনায়ও জলসায়ে এস্তেরাহাত করা হয়।

দ্বিতীয় রাকাত

রাসুল (সঃ) প্রথম রাকাতের পর দ্বিতীয় রাকাতের জন্য দাঁড়িয়ে রফউল ইয়াদাইন করতেন না। সানা ও আউজু পড়তেন না। শুধু বিসমিল্লাহ পড়ে সূরা ফাতেহা পড়ার পর অন্য সূরা পড়তেন, এবং প্রথম রাকাতের মত বাকি সব কিছু পড়তেন। (মুসলিম, মেশকাত ৭৮ পৃষ্ঠা)। দুই রাকাত বিশিষ্ট নামায হলে ২য় রাকাত হত শেষ বৈঠক। সেখানে তিনি বসতেন, এবং আত্তাহিয়্যাতু, দুরূদ, দোয়া মাসুরা পড়ে সালাম ফিরাতেন। (বোখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, নাসাঈ, তিরমিযী, ইবনে মাযা)।এবং ৩ বা ৪ রাকাত বিশিষ্ট নামায হলে মধ্যম বৈঠকে বসতেন এবং শুধু আত্তাহিয়্যাতু পড়তেন। (বোখারী, মেশকাত ৭৫ পৃঃ)। মক্কা মদীনার পদ্ধতি ও হাদীস মোতাবেক অনুরূপ।

আত্তাহিয়্যাতু

التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبى ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عبادالله الصالحين- اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله

আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি ওয়াস্ সালাওয়াতু ওয়াত্ ত্বইয়্যেবাতু আসসালামু আলাইকা আইউহান্নবীয়ু ওয়া রাহমাতুল্লাহী ওয়া বারাকাতুহু। আসসলামু আলাইনা ওয়ালা-ইবাদি ল্লাহিস স্ব-লিহিন। আশহাদু আল্লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু অআশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসুলুহু।

অর্থাৎ ঃ - সব রকম মৌখিক শারীরিক ও আর্থিক ইবাদাত সমূহ একমাত্র আল্লাহরই জন্য। হে নবী তোমার প্রতি আল্লাহর শান্তি রহমত ও বরকত নাযিল হোক এবং আমাদের উপর ও আল্লাহর পূণ্যবান বান্দাদের উপর ও শান্তি বর্ষিত হোক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ছাড়া আর কেউ ইবাদাতের যোগ্য নয়, এবং আমি এও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মুহাম্মাদ (সঃ) আল্লাহর প্রেরিত বান্দা এবং তার রাসুল। (বোখারী, মুসলিম, মেশকাত ৮৫ পৃষ্ঠা)। তাশাহুদে السلام عليك ايها النبى এর স্থলে السلام على النبي পড়া উত্তম। কারণ রাসুল (সঃ) এর ইন্তেকালের পর সাহাবীগণ আস্‌সালামু আল্লান্নবী পড়তেন। (বোখারী)।

তৃতীয় রাকাত

দ্বিতীয় রাকাত পড়ে আত্তাহিয়্যাতু পাঠ শেষ করে হাত দিয়ে মাটিতে ভর করে উঠে (সহীহ ইবনে খুযায়মা ১মঃ ৩৪২ পৃষ্ঠা)। আল্লাহু আকবার বলে কান অথবা কাধ পর্যন্ত হাত উঠিয়ে (বোখারী মুসলিম) রফউল ইয়াদাঈন করবে (বোখারী) এবং বুকের উপর হাত বেঁধে শুধু সূরা ফাতেহা পড়ে এবং অন্য সুরা না মিলিয়ে রুকু করবে অতঃপর সেজদায় যাবে। (সিহাহসিও)।

৪র্থ রাকাত

তৃতীয় রাকাত শেষ করে হাত মাটিতে ভর দিয়ে ৪র্থ রাকাতের জন্য দাঁড়িয়ে যেতে হবে রফউল ইয়াদাঈন করতে হবে না, শুধু রুকুর পূর্বে ও পরে করবে। (বোখারী, মুসলিম মেশকাত ৯৭ পৃষ্ঠা)। তারপর, শেষ বৈঠকের নিয়মে বসে (নামাযে বসার অনুচ্ছেদে দেখুন) আত্তাহিয়্যাতু পড়ে দুরুদ পড়তে হবে।

দুরুদ

اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انک حميد مجيد- اللهم بارک على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انک حميد مجيد -

অর্থাৎ ঃ- হে আল্লাহ তুমি মোহাম্মদ (সঃ) এবং তার আল আওলাদদের উপর ঐ রূপ রহমত নাযিল কর যেমনটি করেছিলে হযরত ইব্রাহীম এবং তার আল-আওলাদদের উপর নিশ্চয় তুমি প্রশংসনীয় ও সম্মানিয়। হে আল্লাহ তুমি মোহাম্মাদ (সঃ) এবং তাঁর আল-আওলাদদের প্রতি ঐরূপ বরকত নাযিল কর যেমন রবকত নাযিল করে ছিলে হযরত ইবরাহীম এবং তার আল-আওলাদদের প্রতি, নিশ্চয় তুমি প্রশংসনীয় ও সম্মানিয়। (বোখারী, মুসলিম, মেশকাত ৮৬ পৃষ্ঠা)।

দোয়ায়ে মাসুরা

রাসুল (সঃ) একদিন এক মুসল্লিকে দুরুদ পাঠের পর তার নিজের জন্য দোয়া করতে বলেছিলেন। (তিরমিযী আবু দাউদ, মেশকাত ৮৬ পৃষ্ঠা)।

আয়শা (রাঃ) বলেন, রাসূল (সঃ) নামাযে এই দোয়াটি পড়তেন।

اللهم انى اعوذبک من عذاب جهنم واعوذبک من عذاب القبر واعوذبک من فتنة المسيح الدجال واعوذبک من فتنة المحيا وفتنة الممات اللهم انى اعوذبک من المأثم والمغرم-

অর্থ ঃ "হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট জাহান্নাম ও কবরের আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আরো দাজ্জালের ফিত্না থেকে আশ্রয় চাচ্ছি। আরো আশ্রয় চাচ্ছি দুনিয়ার জীবনের ফিতনা ও বিপর্যয় এবং মৃত্যুর যাতনা হতে। হে আল্লাহ আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি সমস্ত গুনাহ ও সব রকমের ঋণের দায় হতে।" (বুখারী)

আর আবু কবর রাঃ তায়ালা আনহু বলেন- রাসূল (সঃ) নামাজে আমাকে এই দোয়া শিক্ষা দিয়েছেন-

اللهم انى ظلمت نفسى ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفرلى مغفرة من عندک وارحمنى انک انت الفعور الرحيم

অর্থাৎ ঃ- হে আল্লাহ, নিশ্চয় আমি আমার নিজের উপর বহু জুলুম করেছি অথচ তুমি ছাড়া গুনাহ গুলি মাফ করার আর কেউ নেই, অতএব তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও এবং আমার উপর রহম কর নিশ্চয় তুমি ক্ষমাশীল ও দয়াশীল। (বোখারী মুসলিম, মেশকাত ৮৭ পৃষ্ঠা)।

সেজদায়ে সাহ্ও (ভুলের সেজদা)

মানুষের নামাযেও ভুল ভ্রান্তি হয়। রাসুল (সঃ) ও সাহাবীদেরও নামাযে ভুল হয়েছে। তাই ফরযে ভুল হলে পুনরায় পড়তে হবে। আর ওয়াজেব বা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা জাতীয়ভুল হলে তখন বসে দুটি সেজদা দিতে হয়, এটাকে সেজদায়ে সাহও অথবা ভুলের সেজদা বলা হয়।(বোখারী মুসলিম মেশকাত ৯২ পৃঃ)। যেমন ঃ নামাযী'র রাকাতের গণনায় ভুল হলে বা সন্দেহ হলে বা বেশি হলে বা প্রথম বৈঠকে বসে আতহিয়্যাতু না পড়ে দাঁড়িয়ে গেলে বা কোন ওয়াযেব ছুটে গেলে মুক্তাদীদের মাধ্যমে ভুল সংশোধিত হলে। নামায অবস্থায় যেভাবে সেজদা দিতে হয় ঐ ভাবে একই নিয়মে তাকবিরে সহ দুটি সেজদা দিতে হবে এবং সেজদা দিয়েই ডাইনে বামে সালাম ফিরাতে হবে। তাশাহুদ পড়তে হবে না। (বোখারী মুসলিম, মেশকাত ১১৭ পৃঃ)। দুটি ছেজদা ছালামের পরে ও দিয়ে নামায শেষ করা যায়।(বুখারী মুসলিম) ইমামের ভুল হলে মুক্তাদী সুবহা-নাল্লা ও মহিলা মুক্তাদী বাম হাতের উল্টা পিঠে তালি দিবে।

(বোখারী মুসলিম, মেশকাত ৯১ পৃঃ)। ২৯

২৯ হানাফী– মাহযাবের অনুসারীগণ দুই দিকে সালাম না ফিরায়ে একদিকে সালাম ফেলানোর পর সাহ্ও সেজদা দেন এটা হাদীস বিরোধী কাজ। সুতরাং হানাফী মাযহাবের বিখ্যাত ফেকাহ হেদায়ার ব্যাখ্যাকারী আল্লামা ইবনে হুম্মাম লিখেছেন এটা বেদাত। (শরিয়াতের মধ্যে নতুন আবিষ্কৃত) (ফতহুল কাদীর ১ম ২২২ পৃঃ।)

তারপর সাহও সেজদার পর আবার তাশাহুদ পড়ার প্রচলন হানাফী মাযহাবে রয়েছে। সেটা ও সহীহ হাদীস ভিত্তিক নয়। (নাইলুল আওতার ২য় ৩৭৩ পৃঃ)। এ ব্যাপারে আল্লামা হাফেজ যয়লয়ী বলেন সাহাও সেজদার পর তাশাহুদ পড়ার প্রমানে কোন সহীহ হাদীস নেই। (নসবুর রায়া)। সালামের পূর্বে দুটি সাহ্ও সেজদা দেওয়ার সহীহ হাদীসটি মেশকাতের অনুবাদক অনুবাদ করার পর বলেছেন। এই হাদীস অনুযায়ী ইমাম আবু হানিফা (রহ) বলেন সাহও সেজদা হবে সালামের পূর্বে। তারপর তিনি লিখেছেন কিন্তু হানাফী মতে নামাযের শেষ বৈঠকে তাশাহুদ পড়িয়া শুধু ডান দিকে ১টি সালাম ফিরাইবে অতঃপর সাহওর জন্য দুটি সেজদা করিবে (বাংলা মেশকাত ২৪ পৃঃ)। পাঠকগণ প্রচলিত হানাফী মাযহাব যে ইমাম আবু হানিফার যাযহাব নয় এবং ইমাম আবু হানিফা যে সহীহ হাদীসের পক্ষের লোক ছিলেন তার জলন্ত প্রমাণ তাদের লেখা কেতাবে পেলেন। প্রচলিত হানাফী নামাযে সাহও সেজদার পদ্ধতি যে বিশ্ব নবী (সাঃ) পদ্ধতি নয় এবার মনে হয় আর বুঝতে বাকি থাকল না, তাই এটাকে বিশ্বনবীর পদ্ধতি বলা শুধুমাত্র নামনিহাদ মুফতীদের বুলি। যারা না মানে তাদের ইমামের সিদ্ধান্ত, না মানে রসুল (সাঃ) এর সহীহ হাদীসের সিদ্ধান্ত, না মানে তাদের ফেকার সঠিক সিদ্ধান্ত। আল্লাহ সকলকে সহীহ হাদীসের উপর আমল করার তৌফিক দিন। আমীন।

সালাম ফিরান

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসুল (সঃ) দুরুদ ও দোয়ায়ে মাসুরা পড়ার পর ডান ও বাম দিকে এই বলে السلام عليكم ورحمة الله আস্সালাম আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লা বলে সালাম ফিরাতেন। সালামের অর্থ (হে কাঁদের ফেরাস্তা ও মুক্তাদী ও ফেরেশতা গণ) তোমাদের প্রতি আল্লাহর শান্তি ও রহমত বর্শিত হোক। সালাম ফিরানোর প্রচলন আছে। সালাম ফিরানোর সময় ওয়া রহমাতুল্লাহর পর وبركاتة- (ওয়াবারাকাতুহ্) বলা যায়, (আবু দাউদ বুলুগুল মারাম ২৩ পৃঃ)। একদিকে সালাম ফিরানোর হাদীস যোহায়ের ইবনে মুহাম্মাদের কারণে সহীহ নয়। ৩০

৩০ রাসুল (সঃ) বলেছেন নামায শুরু হয় আল্লাহু আকবার দিযে আর শেষ হয় সালাম দিয়ে। (তিরমিযী ১মঃ ৫৫ পৃষ্ঠা)। রাসুল (সঃ)এর স্বর্ণ যুগে ওভাবেই নামায শুরু এবং শেষ করা হত অদ্যবধিও তাই হয়। কিন্তু প্রচলিত হানাফী মাযহাবের ফেকাহর কেতাবে লেখা হয়েছে নামায শুরু করা যায় আল্লাহ আকবারের পরিবর্তে الله اعظم। আল্লাহু আজম বা ফারসিতে আল্লাহ বুযুর্গাস্ত দিয়ে। আর নামায শেষ করা যায় সালামের পরিবর্তে الخروج بضعة منها অপান বায়ু নিঃস্বরনে। (হেদায়া, দুর্রে মুখতার ১ম খন্ড ৩২১ পৃঃ)।

এখন যদি মুফতী সাহেব বলেন এসব ফেকাহর মাসলার উপর আমাদের আমল নেই এসব কথা কেন? তাহলে আমি বলব আপনাদের ফতোয়ার ভান্ডার যেখানে ময়লা —— রয়েছে সেখানে আপনারা শাফেয়ী, মালেকী, হাম্বলী, আহলে হাদীস-যারা সবাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অনুসারী তাদের সবার উপর প্রাধান্য বিস্তার করার অপচেষ্টায় কিভাবে লিখলেন যে, বিশ্বনবী (সঃ) এর নামাযই একমাত্র হানাফী মাযহাবের নামায? আর সবই বাতিল। বিস্ময়কর ব্যাপার হলো আজ পর্যন্ত আপনাদের মাযহাবের যত বিদ্যান ছিলেন যেমন আল্লামা শওকানী আল্লামা আইনী, আল্লামা আব্দুল হাই লাখনবী, আল্লামা আনোয়ার সাহা কাশমিরী, আল্লামা জাফর আহমাদ ওসমানী, আল্লামা কাসেম নানুতুবী, আল্লামা শামসুল হক ফরিদপুরী (রঃ) প্রমুখ এনারা এহেন শিরোনামে কোন বই রচনার নির্বুদ্ধিতা দেখাননি। আলোচিত বইয়ের লেখকের এ ধরনের প্রচেষ্টাকে কি বলব "হাতি ঘোড়া গেল তল, মশা বলে কত জল।"

সালামের পর মুসল্লিদের দিকে ঘুরে বসা ও দোয়া পড়া

ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত রাসুল (সঃ) প্রত্যেক ফরজ নামাযে সালাম ফিরানোর পর মুসল্লিদের দিকে ফিরে বসতেন।(বোখারী ১মঃ ১১৮ পৃঃ)। রাসুল (সঃ) সালাম ফিরানোর পর কখনও ডান, কখনও বাম দিকে বা কখনও পুরা শরীর

মুক্তাদীর দিকে ঘুরিয়ে বসতেন।(বোখারী, মুসলিম, মেশকাত হাঃ নং-৯৪৪)।

রাসুল (সঃ) নামাযে সালাম ফিরানোর পর বলতেন আল্লাহ আকবার, এবং সেটা জোরে হত।(বোখারী, মসুলিম মেশকাত ৮৩ পৃষ্ঠা)। তারপর তিনবার আস্তাগফিরুল্লাহ বলতেন, (মুসলিম মেশকাত ৮৮ পৃষ্ঠা)। তারপর পড়তেন–

আল্লাহুম্মা আনতাস সালাম অমিনকাস সালাম তাবারাকতা ইয়াযাল্‌যালানি ওয়াল ইকরাম। (মেশকাত ৮৮ পৃঃ)। রাসূল (সঃ) উক্ত তিনটি দোয়া কেবলা মুখী হয়ে পড়তেন তারপর ডান অথবা বামদিক দিয়ে মুসল্লীদের দিকে ফিরে বসতেন। (বোখারী , মুসলিম মেরআত ১মঃ ৭৭১ পৃষ্ঠা)।

এ ব্যাপারে হানাফী ফেক্কাহর সাক্ষ্য ও রয়েছে তাই ফেকাহ গায়াতুল আওতাবের মধ্যে লেখা হয়েছে। ইমাম সালাম ফিরানোর পর ডাইনে অথবা বামে, অথবা মুক্তাদীর দিকে মুখ করে বসবেন। (গায়াতুল আওতার ১মঃ ২৪৮ পৃষ্ঠা)।

বিশ্ব নবী (সঃ) এর নামাযই হানাফী মাযহাবের নামায নামক বই এর লেখক সালাম ফিরানোর পর মুক্তাদীদের দিকে সকল নামাযে ঘুরে বসার দুটি হাদীস এনেছেন বটে, তবে উনারা কিন্তু নিজে সকল নামাযে মুক্তাদীর দিকে ঘুরে বসেন না- এটা তাহলে মানুষদেরকে সাফ একটা ধোকা দেওয়ায় জন্য এনেছেন। হাদীসে সালাম ফিরানর পর ঘুরে বসে আরও কিছু দোয়া পড়ার কথা আছে। যেমনঃ - رب اعنى على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك রব্বি আইন্নি আলা যিকরিকা ওয়াশুকরিকা ওয়া হুসনি ইবাদাতিকা-

অর্থাৎ - তুমি আমাকে তোমার যিকির করা, তোমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা, তোমার উৎকৃষ্ট ইবাদাত করার কাজে সাহায্য কর। (আবু দাউদ মেশকাত ৮৮ পৃষ্ঠা)।

لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله المحد وهو على كل شى ء قدير، اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطى لما منعت ولا ينفع ذالجد منك الجد

উচ্চারণ ঃ - লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা-শারিকা লা হলাহুল-লাহুল মুলক **ওয়ালাহুল হামদু** ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শায়ইন কাদীর। আল্লাহুম্মা লা মা-নিয়া **লিমা আ'তা**য়তা ওয়ালা মু'তিয়া লিমা মানাতা ওয়ালা ইয়ান ফাউ যাল যাদ্দি **মিনকাল যাদ্দ।**

অর্থাৎ ঃ একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই যিনি একক তার কোন

শরীক নেই। সকল প্রকার মালিকানা তারই। তারই জন্য যাবতীয় প্রশংসা তিনি সকল জিনিষের উপর ক্ষমতা শালী। হে আল্লাহ তুমি যা দান কর, তা রোধ করার ক্ষমতা কারুর নেই। আর কোন মর্যাদা বানের মর্যাদা তোমার নিকট থেকে কোন উপকার পাইয়ে দিতে পারে না। (বোখারী, মুসলিম মেশকাত ৮৮ পৃষ্ঠা)।

اللهم انى اعوذبك من الجبن واعوذ بك من البخل واعوذبك من ارذل العمر واعوذبك من فتنة الدنيا اعوذبك من عذاب القبر

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা ইন্নী 'আউযুবিকা মিনাল্‌ জুব্‌নি ওয়া 'আউযুবিকা মিনাল বুখ্‌লী ওয়া 'আউযুবিকা মিন্‌ আর্‌ যালিল উমুরি ওয়া 'আউযুবিকা মিন ফিত্‌নাতিদ্‌ দুন্‌ইয়া-ওয়া আযা-বীল্‌ কাব্‌র।

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে কাপুরুষতা এবং কৃপণতা হতে আশ্রয় চাচ্ছি। আরো বার্ধক্যের লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও দুনিয়ার ফিতনা ফাসাদ এবং আযাব হতে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। (বুখারী , মিশকাত)।

আয়াতুল কুরসীর ফযীলাত

নবী (সঃ) বলেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরয নামাজের পর আয়াতুল কুরসী পড়বে তাকে মৃত্যু ছাড়া আর কোন জিনিষই জান্নাতে পৌছাতে বাঁধা দিতে পারবে না। (নাসাঈ, ইবনে হিব্বান, বুলুগুল মারাম ৮৬ পৃঃ)।

الله لا اله الا هو الحى القيوم لا تا خذه سنة ولا نوم له ما فى السماوات وما فى الارض من ذا الذى يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهوا العلى العظيم–

উচ্চারণ ঃ- আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাহু অয়াল হাইয়ুল কাইয়ুম, লা-তা খুয্‌হু সিনাতুউ ওয়ালা নাউমুন - লাহু মাফিস সামাওয়াতি ওয়ামা ফিল আরযি মান যালল্লাযি ইয়াশফাউ ইনদাহু ইল্লা বিইজনিহী ইয়া লামু মা বাইনা আইদি-হিম

ওয়ামা খালফা হুম ওয়ালা ইউহিতুনা বিশাইয়িম মিন ইলমিহী ইল্লা বিমাশা অসিয়া কুরসী ইউহুস সামাওয়াতি ওয়ালআরযা ওয়ালা ইয়াউদু হু হিফযুহুমা ওয়াহু অল আলিউল-আযীম। অর্থাৎ ঃ- আল্লাহ যিনি ব্যতীত অন্য কোন মাবুদ নেই। যিনি চিরুঞ্জীব, চিরস্থায়ী, তাকে তন্দ্রা এবং নিদ্রা স্পর্শ করে না, আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে সবই তাঁর অধীনে, কে এমন আছে যে তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর কাছে সুপারিশ করতে পারে? তিনি মানুষের সামনের ও পিছনের সব ব্যাপারই জানেন। কিন্তু মানুষ আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত তার ইলমের কিয়াদংশ ও কেউ আয়ত্ত্ব করতে পারে না। তার সিংহাসন সমগ্র আসমান সমূহ ও জমিনের ব্যপ্ত আছে। আসমান ও যমিনের দেখা শোনা তাকে ক্লান্ত করতে পারে না। কারণ তিনি বহু উন্নত ও মহান।

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসুল (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাযের পরে সুবহা-নাল্লাহ্ ৩৩ বার। আলহামদুল্লিাহ ৩৩ বার। আল্লাহু আকবার ৩৪ বার পড়ে, অথবা উক্ত ৩ তাসবিহ্ ৩৩ বার করে পড়ার পর লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহুলা শারিকালাহু লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শায়ইন কাদীর ১ বার পড়ে ১ শতবার পুরাবে তার সমস্ত গোনাহ মাফ হয়ে যাবে। যদিও তা সমূদ্রের ফেনার মত হয়।(মুসলিম, বুলুগুল মারাম, মেশকাত ৮৯ পৃষ্ঠা)।

জামাতের বিবরণ

আল্লাহ বলেন- اقيم الصلاة তোমারা (সকলেই) নামায কায়েম কর।

অন্যত্র বলেন واركعوا مع الراكعين তোমরা (সকলেই) রুকুকারীদের সাথে রুকু কর। এতে বোঝা যার ফরয নামায জামাতের সাথে পড়তে হয়। রসুল (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি আযান শুনে জামাতে আসে না (ওযর ছাড়া) তার নামায হয় না। (ইবনে মাযাহ্, দারাকুতনী, মেশকাত ৯৬ পৃঃ)।

একাকী নামায পড়ার চেয়ে জামাতে ২৭ গুণ বেশি নেকি পাওয়া যায়। (বোখারী, মুসলিম মেশকাত ৯৬ পৃষ্ঠা)। অপর দিকে জামাত তরক কারীদের ব্যাপারে রসুল (সঃ) কঠোরভাবে বলেছেন যদি তাদের ঘরে বাচ্চা ও মহিলা না থাকত তাহলে তাদের সহ ঘর বাড়ী আগুনে জ্বালিয়ে দেওয়ার হুকুম দিতাম।(বোখারী, মুসলিম, মেশকাত ৯৫ পৃষ্ঠা)। দু'জন লোক হলে জামাত করা যাবে তবে সংখ্যায় বেশি হলে আল্লাহর কাছে প্রিয়। (আবু দাউদ, মেশকাত ৯৬ পৃঃ)। জামাতে নামায পড়তে গেলে রসুল (সঃ) বলেছেন- সেই ব্যক্তি ইমাম হবেন যিনি তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ভাল কোরআন পড়তে পাবেন। যদি কোরআন পড়ায় সকলেই

সমান হন। তাহলে যিনি বেশি জ্ঞানী তিনি হবেন **ইমাম**। যদি হাদীসের জ্ঞানে সকলেই সমান হন তাহলে প্রথম হিযরতকারী হবেন ইমাম। এতে যদি সকলেই সমান হন তাহলে প্রথম যিনি বয়সে বড় তিনিই হবেন ইমাম।(মুসলিম মেশকাত ১০০ পৃঃ)। ৩১

৩১ এ সকল শর্ত বাদ বিচার করে কে হবেন ইমাম তা নির্ণয় করা সম্ভব। কিন্তু প্রচলিত হানাফী মাযহাবের ফেকাহ এর কেতাবে দেখি লেখা হয়েছে এ সকল শর্তে যদি সমান সমান হন তাহলে দেখতে হবে زوجة ثم الحسن *অর্থাৎ কার স্ত্রী সুন্দরী (দুররে মোক্তার ৪১৬ পৃষ্ঠা)। ছিশরী ছাপা। তাতে সকলের সমান সমান হলে দেখতে হবে* ثم الاكبر رأسا والاصغر عضوا *কার মাথা বড় এবং গোপনাংঙ্গ ছোট সেই হবেন ইমাম। (দুররে মোক্তার ১ম খন্ড ৪১২ পৃঃ)। আরবী মি-শরী ছাপা। তারপর লেখা হয়েছে* ان المراد عضو الزكر *অর্থাৎ ওজবে জাকার এর অর্থ হচ্ছে পুরুষাঙ্গ। (দেখুন দুররে মোক্তার, তহাবী ১ম খন্ড পৃঃ)। মিশরী ছাপা। ইমামাতের এ সব শর্ত নির্ণয় করা কি করে সম্ভব তা ফেকাহর রচয়িতারাই ভাল জানেন আমাদের বোধ গম্য হয় না। বলা বাহুল্য এ ধরণের নিজেদের মন গড়া শর্ত কখনও বিশ্বনবী (সাঃ) ইমামতের শর্ত হতে পারে না।*

নামাযরত অবস্থায় যে সব কাজ বৈধ

নামাযরত অবস্থায় ছোট বাচ্চাকে কোলে নেওয়া এবং রুকু সেজদার সময় নামিয়ে দেওয়া। (বোখারী, মুসলিম হাঃ নং-৫৪৩)। নামাযীর সামনে দিয়ে অতিক্রমকারিকে হাত দ্বারা বাধা দেওয়া। (বোখারী মুসলিম হাঃ নং-৩০০৮)। কাপড়ে বা রোমালে থু থু ফেলা। (মুসলিম হাঃ নং-৩০০৮)। অভ্যাস নয় পরিধেয় বস্ত্র সমশ্য হলে তা ঠিক করে নেওয়া। (বোখারী)। পুরুষ নামাযী সুবহানাল্লাহ বলে ও মহিলা নাম-যী হাতের উল্টা পিঠে তালী মেরে লোকমা দেওয়া। (বোখারী হাঃ নং-১২০১)। হাত বা মাথার ইশারায় কোন কিছুর জবাব দেওয়া। (বোখারী মুসলিম, হাঃ নং-৮৩৪)। মুখে কিছু না বলে শুধু হাতের ইশারায় সালামের জবাব দেওয়া। (আবু দাউদ হাঃ নং-৯১৫)। আল্লাহর ভয়ে জান্নাত এবং জাহান্নামের আলোচনায় ক্রন্দন করা। (নাসাঈ ইবনে খুয়ায়মা ২য় ঃ ৫৩ পৃঃ)। হাছি দেওয়ার পর মনে মনে আলহামদু লিল্লাহ বলা। (তিরমিযী হাঃ নং-৪০৪)।

নামাযরত অবস্থায় যেসব কাজ নিষিদ্ধ

নামাযের মধ্যে কোমরে হাত রাখা।(বোখারী হাঃ নং-৬৮৪)। আকাশের দিকে তাকান। (মুসলিম হাঃ নং-৪২৯)। মন কেড়ে নেওয়ার মত কোন ছবির দিকে দৃষ্টি দেওয়া। (বোখারী হাঃ নং-৭৫২)। এক হাতের আঙ্গুল অন্য হাতের আঙ্গুরের মধ্যে ঢুকান। (তিরমিযী হাঃ নং-৪৪৪)। নামাযরত অবস্থায় আঙ্গুল মটকান। (ইরওয়া উল গালীল ২য় ৯৯ পৃঃ)। হাই তোলা (বোখারী হাঃ নং-৭৫২)। চক্ষু বন্দ রাখা। (মুসলিম হাঃ নং-৩০০৮)।

রুকু সেজদায় কোরআন পাঠ। (মুসলিম ৪৭৯)। সেজদার সময় দুই হাত কনুই পর্যন্ত মাটিতে বিছিয়ে দেওয়া। (বোখারী হাঃ নং-৮২৩)। সেজদার জায়গা হতে পাথর, বালি, মাটি একবারের অধিক সরানো। (বোখারী হাঃ নং-১২০৭)। ইমামের পূর্বে কোন কিছু করা (বোখারী হাদীস নং-৬৯১)। ইত্যাদি।

ইমাম মুক্তাদীর নামাযের মধ্যে কিছু পার্থক্য

মুক্তাদী কোন রোকন ইমামের আগে করবে না। তাহলে নামায হবে না। (মুসলিম) সব কাজ ইমামের পরে করবে। তবে এতো দেরিতে করবে না যাতে ইমাম এবং মুক্তাদীর ভিতরে কোন মত বিরোধ সৃষ্টি হয়। তাকবীরে তাহরিমার সময় ইমাম আল্লাহু আকবার বলা সম্পূর্ণ শেষ না হলে, মুক্তাদী আল্লাহু আকবার বলবে না ৩২

৩২ নবী (সঃ) এর হুকুম ইমাম যখন তাকবীর বলে তখন তোমরা তারবীর বল। ইমামের তাকবীরে বলা তখন হবে যখন ইমাম আল্লাহু আকবার বলবে। ইমাম যদি শুধু আল্লাহু বলে তাহাল তাহার তাকবীর বলা হলো না যতক্ষন আল্লাহু আকবার সম্পূর্ণ না বলবে। যেমন আপনি কাউকে বললেন অমুকের নামায পড়া শেষ হলে তার সাথে কথা বলো। অর্থাৎ তার জন্য অপেক্ষা কর। তার নামায পড়া শেষ হোক। যখন শেষ হবে তখন তার সাথে কথা বলবে, কিন্তু এটা নয় যে সে নামায পড়তে থাকুক আর তার সাথে তুমি কথা বলতে থাকো। এভাবেই রাসূল (সঃ) বলেছেন ইমাম যখন তাকবীর বলবে (অর্থাৎ তারবীর বলার পর শব্দ বন্ধ হয়ে যাবে) তোমরা তখন তাকবীর বলবে।

ইমাম রুকুতে যাওয়ার সময় আল্লাহু আকবার বলা সম্পূর্ণ শেষ না হওয়া পর্যন্ত মুক্তাদী আল্লাহু আকবার বলে মাথা ঝুকাবে না। তারপর আল্লাহু আকবার বলে মাথা ঝুকাবে। ইমামের সামি আল্লাহু লিমান হামিদা বলা শেষ না হওয়া পর্যন্ত রুকুতে থাকবে। তারপর রব্বানা লাকাল হামদু বলে মাথা উঁচু করবে। মুক্তাদী ও সামি আল্লাহু লিমান হামিদা বলার কোন সহীহ হাদীস নেই। (ফতহুল বারী) সেজদার সময় ইমামের আল্লাহু আকবার বলা সম্পূর্ণ শেষ হলে সচারাচার দেখবেন তার কপাল মাটিতে ঠেকে যায়। মুক্তাদী ততক্ষণ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকবে। (বোখারী) তারপর আল্লাহু আকবর বলে সেজদায় লুটিয়ে পড়বে। এভাবে সমস্ত আরকান আদায় করতে হবে। ইবনে মাসুদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি এক ব্যক্তিকে ইমামের আগে আগে (বা সাথে সাথে) এসব কাজ করতে দেখে বললেন-তোমার নামায না একাকী হলো না জামাতে হল (মুসলিম) ইমামের সাথে সাথে করলে ও মুক্তাদীর নামায হবে তার কোন প্রমাণ নেই। ইমাম দাড়িয়ে নামায পড়লে মুক্তাদীও দাঁড়িয়ে নামায পড়বে। আর ইমাম বসে নামায পড়লে মুক্তাদীও বসে নামায পড়বে তাই মুক্তাদীর বসে নামায পড়ার ওযর হোক বা না হোক। (বোখারী মুসলিম) মুক্তাদী যে কোন সময় সুরা ফাতেহা ইমামের পিছনে

পড়তে পারে তবে ইমাম যখন জোরে কেরাত পড়বে তখন মুক্তাদী ইমামের বিরতির সময় সময় পড়বে এবং শুনবে। (দারাকুতনী) আর যদি ইমাম মুর্খ হয় বিরতি না দেয় তা হলে তার সাথে সাথে পড়বে অথবা তার আগে পড়বে অথবা তার পরে পড়বে। কোন অবস্থায় ছাড়বে না। (আবু দাউদ ১ম খন্ড ১২১ পৃষ্ঠা)। ইমাম আমীন না বলা পর্যন্ত মুক্তাদী আমীন বলবে না। যে মুক্তাদী পরে এসে ইমামের সঙ্গে শরীক হবে তিনি ইমামকে যে অবস্থায় পাবে সেই অবস্থায় তার সঙ্গে শরিক হবে। ছুটে যাওয়া রাকাত সালাম ফিরানোর পর পড়ে নিবে। ইমামকে রুকুতে পাওয়া ব্যক্তির ঐ রাকাত হবে না। পরে সে রাকাত পড়ে নিতে হবে। বিস্তারিত দেখুন আমার লেখা রুকু পেলে রাকাত হবে না নামক পুস্তিকাটি। ইমাম আস্সালামু আলাইকুম অ রহমাতুল্লাহ বলে মুখ না ফিরানো পর্যন্ত মুক্তাদী আস্সালামু রহমাতুল্লাহ বলে মুখ ফেরাবে না।

কাযা নামাযের বিবরণ

রাসুল (সঃ) বলেছেন যদি কেউ নামাযের কথা ভুলে যায় অথবা ঘুমিয়ে থাকার কারণে সময় চলে যায় তাহলে যখনই মনে হবে অথবা ঘুম থেকে জাগ্রত হবে, তখনই নামায আদায় করে নিবে। (বোখারী, মুসলিম, মেশকাত ৬১ পৃষ্ঠা)। সূর্য্য ডোবার অথবা ওঠার আগে যদি এক রাকাত পড়ার সুযোগ হয় তাহলে কাযা নামায পড়া যাবে। (বোখারী, মুসলিম, মেশকাত ৬১ পৃষ্ঠা)। কাযা নামাযের জন্য ওয়াক্তের অপেক্ষা করতে হয় না। সুযোগ হলেই ইকামাত দিয়ে নামায পড়ে নিবে। কাযা নামাযে আযান ও দেওয়া যায়। (ফেকহুস সুন্নাহ। ১মঃ ১৬৪ পৃষ্ঠা)। ৩৩

৩৩ ওমরী কাযা নামে (জীবনের প্রথম যুগে যে সব নামায কাযা হয়েছে) সেটা হানাফী মাযহাবে পড়ার প্রচলন আছে। এটা নামনিহাদ মুফতীদের আবিষ্কৃত ফতোয়া। অতীত ছুটে যাওয়া নামায টেনে আনার কোন বিধান ইসলামী শরিয়তে নেই তৌওবা ও ইস্তেগফার করলেই চলবে। ওদিকে হাদীস ও রয়েছে ফরয নামায কম পড়ে গেলে নফল নামায তা পূরণ করে দিবে। (আবু দাউদ আহমাদ, মেশকাত ১১৭ পৃষ্ঠা)। সে জন্য নফল যত বেশি পড়া যায় ততই লাভ।

জুমআর নামাযের বিবরণ

জুমআর নামায ফরয। (সুরা জুমআ) নবী (সঃ) মেম্বরে উঠে ঘোষণা দেন যে, মানুষের জুমআ তরক করা উচিত নয় তাহলে আল্লাহ তাদের অন্তরে মহর মেরে দিবেন ফলে তারা (ইবাদাতের প্রতি) গাফেল হয়ে যাবে। (মুসলিম, মেশকাত ১২০ পৃষ্ঠা)। সাহাবীগণ ২ থেকে ৬ মাইল পথ হেঁটে গিয়ে জুমআ পড়তেন। (বোখারী, ১মঃ ১২৩ পৃষ্ঠা)। নবী (সঃ) বলেছেন যে, ব্যক্তি জুমআর দিন গোসল করে সাধ্য অনুযাই পাক পবিত্র হয়ে তৈল অথবা সুগন্ধি জাতীয় কিছু ব্যবহার করে বের হয় এবং

দু'জনের মাঝে ফেড়ে সামনে না গিয়ে সাধ্য অনুযাই নামায আদায় করে তার পর মনযোগ সহকারে খোৎবা শ্রবণ করে এবং নীরব থাকে। তাহলে আল্লাহ তার গত জুমআ হতে এ জুমআ পর্যন্ত যত সাগীরা গোনাহ আছে তা মাফ করে দেবেন। (বোখারী মেশকাত ১২০ পৃষ্ঠা)। রাসুল (সঃ) বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ জুমআর দিন এমন অবস্থায় আসে যে ইমাম খোৎবা দিচ্ছেন তখন সে যেন হালকা করে দু-রাকাত নামায পড়ে নেয়। (বোখারী মুসলিম, মেশকাত হাদীস নং-১৩২৭)। আবু সুলায়েখ গাতফানী খোৎবা চলাকালীন অবস্থায় এসে দু-রাকাত নামায না পড়ে বসে গেলে রাসুল (সঃ) তাকে খোৎবা চলাকালীন অবস্থায় উঠে দু-রাকাত নামায পড়ার আদেশ দিলেন তার পর উক্ত হাদীসটি বললেন। (মুসলিম ১মঃ ২৮৭ পৃষ্ঠা)। হানাফী ফিকাহের মধ্যেও লেখা হয়েছে খোৎদা চলা কালীণ দু রাকাত নামায পড়া এটা সুন্নাত। (দেখুন ফেকাহা হেদায়া প্রথম খন্ড ২৮৭ পৃঃ। ফেকাহ শরাহ বেকায়া -১৪৮ পৃঃ)। তাই বর্তমান হানাফী মাযহাবে খোৎবা চলাকালীন অবস্থায় নামায না পড়ে বসার যে প্রচলন আছে ওটা হাদীসের বিরুদ্ধাচারণ বই কিছুই নয়। রাসুল (সঃ) মেম্বারে উঠে লোকদের মুখমুখি হয়ে সালাম করতেন। (ইবনে মাযা, যাদুল মায়াদ ১মঃ ৪১৪ পৃষ্ঠা)। তার পর বসতেন এবং আযানের পর লাঠির উপর ভর দিয়ে দাঁড়াতেন (আবু দাউদ হাঃ নং-১০৯৬)। খোৎবা দেওয়ার সময় তিনি শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করতেন। (মুসলিম হাদীস নং-৮৬৭)। কেউ কোন ভুল করলে খোৎবা অবস্থায় নিষেধ করতেন।(বোখারী হাং নং-৯৩১)। শ্রতাদের ভাষায় খোৎবা দিতেন তাই শ্রতা কর্তৃক কোন প্রশ্নের সম্মুখিন হলে খোৎবা চলাকালিন অবস্থায় তার উত্তর দিতেন প্রয়োজনে কখনো মেম্বর থেকে নেমে প্রয়োজন সেরে আবার মেম্বারে উঠে খোৎবা শেষ করতেন। (বোখারী হাঃ নং-৩৫৮৪)। প্রয়োজনে কাউকে ডাকতেন কিছু আদেশ ও করতেন।(বোখারী হাঃ নং-৩৫৮৪)। জুমআর আগে ও পরের সুন্নাত সম্পর্কে সুন্নাত নামাযের অনুচ্ছেদে দেখুন। জুমআর মহিলাদের অংশ গ্রহণে কোন বাধা নেই। (আবু দাউদ) কিন্তু ফরয নয় তবে তারা পর্দাহীন ও সুগন্ধী মেখে যেন না আসে (আবু দাউদ) গ্রামে জুমআ জায়েজ নেই বলে হানাফী মাযহাযে যে প্রচলন আছে যার কারণে অনেকে আবার আখেরী যোহর পড়ে থাকেন এটা হাদীস বিরোধী তথা বিশ্বনবী (সঃ) এর পদ্ধতি নয়। গ্রামে জুমআ জায়েজ। (বোখারী, মুসলিম)

কসর বা সফর নামাযের বিবরণ

কসর অর্থ কমানো। ৪ রাকাত নামায ২ রাকাত পড়াকে কসর বলে। আল্লাহ

বলেন, "তোমরা যখন সফর কর তখন নামাযে কসর করায় কোন গোনাহ নেই। (নিসা ১০১ আয়াত)। আল্লাহ কোরআনে কসরে ভীতির কথা উল্লেখ করায়, হযরত ওমর (রা), রাসুল (সঃ) নিকট তা জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, এখন তো ভয়ভীতি নেই এখন কসর পড়া যাবে কি না? উত্তরে রাসুল (সঃ) বলেছিলেন, আল্লাহ এটিকে তোমাদের সদকা হিসাবে দান করেছেন অতএব তোমরা ওটা কবুল কর।(মুসলিম মেশকাত হাদীস নং-১৩৩৫)। মক্কা বিজয়ের পর রাসুল (সঃ) ভীতি শুন্য অবস্থায় সাহাবীদের নিয়ে কসরের নামায আদায় করেছেন।(বোখারী মুসলিম, মেশকাত হাঃ নং-১৩৩৬)। রাসুল (সঃ) মিনাতে নিরাপদ অবস্থায় কসর পড়েছিলেন। সেখানে মুকিম ও মুসাফির সকল সাহাবী উপস্থিত ছিলেন। (বোখারী, মুসলিম, মেশখাত হাঃ নং-১৩৩৪)।

কসরের দুরত্বের ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। কোরআনে দুরত্বের ব্যাখ্যা নেই। রাসুল (সঃ) মিনাতে যে কসরের নামায পড়ে ছিলেন সেটা মক্কা থেকে ৯ মাইল দুরে। হজ্বের সফরে রাসুল (সঃ) মদিনা থেকে বের হয়ে ৩ মাইলের মাথায় জুলহুলায়ফা নামক স্থানে এসে কসর সহ আসর পড়েছেন। (বোখারী, মুসলিম মেশকাত হাঃ নং-১৩৩৩)। এতে বোঝা যায় সফরে বের হলে কিছু দুর যেয়ে কসর করা যায়। হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রা) বলেন– রাসুল (সঃ) ১৯দিন সফরে অবস্থান কালে কসর করেছেন। আমরাও তাই করি এর বেশি হলে পুরা করি। (বোখারী, মেশকাত হাঃ নং-১৩৩৭)। সিদ্ধান্তহীন অবস্থায় ১৯ দিনের বেশি হলে কসর করা যায়। সফরে থাকাকালীন যোহর আসর ও মাগরিব ঈশা পৃথক ইকামাতের মাধ্যমে জমা করে পড়ার নিয়ম রয়েছে। (বোখারী মেশকাত হাঃ নং-১৩৩৯)। সফরে রাসুল (সঃ) সুন্নাত পড়তেন না। (বোখারী, মুসলিম, মেশকাত হাঃ নং ১৩৩৮)। অবশ্যই ফযরের সুন্নাত ও বেতের পড়তেন। (বোখারী মুসলিম মেশকাত হাঃ নং-১৩৪০)। মুসাফের ইমাম হলে কসর করবে কিন্তু মুকিম ব্যক্তি ইমাম হলে মুসাফের মুকিম ইমামের সঙ্গে পুরা পড়বে এমন কি কিছু রাকাত শেষ হওয়ার পর জামাতে যোগ দিলেও তাকে পূর্ণ নামায আদায় করতে হবে। এটিই নবী (সঃ) এর সুন্নাত। (আবু আওয়ানা, ইরওয়াউল গালীল ৩য় ২১ পৃষ্ঠা)।

অসুস্থ ব্যক্তির নামায

নবী (সঃ) বলেন অসুস্থ ব্যক্তি দাঁড়িয়ে নামায আদায় করবে; না পারলে বসে। রুকু সেজদা করতে না পারলে মাথার ইশারায় রুকু সেজদা করবে তবে সেজদার জন্য মাথা একটু বেশি ঝুকাবে এতেও না পারলে ডান কাথে

কেবলা মুখি হয়ে শুইবে এবং ইশারায় নামায পড়বে। (বোখারী নাইলুল আওতার ৩য় ১৯৮ পৃষ্ঠা)। এতেও অক্ষম হলে পা কেবলামুখি করে চিত হয়ে শুয়ে মাথা একটু উঁচু করে ইশারায় নামায পড়বে।(দারা কুতনী নাইল ৩য় ১৯৮ পৃষ্ঠা)। তবে বালিশের ওপর সিজদা চলবে না। (বায়হাকী, বুলুগুল মারাম ১১৪ পৃষ্ঠা)। এতেও যদি সক্ষম না হয় তাহলে মাফ। ৩৪

৩৪ কিন্তু প্রচলিত হানাফী মাযহাবে মৃত্যুর পর নামাযের কাফফারা ধরে তা আদায় করে থাকেন। এটা পেট পুজারীদের আবিষ্কৃত একটি পদ্ধতি এটা কখনও বিশ্ব নবী (সঃ) এর পদ্ধতি নয়। আল্লাহ আমাদের সবাইকে এহেন খপ্পর থেকে রক্ষা করুন। আমীন।

ইশরাকের নামাযের বিবরণ

ইশরাক শব্দের অর্থ আলোকিত হওয়া। সূর্য্য উদয়ের পর আলোকিত হলে যে নামায পড়তে হয় তাকে ইশরাকের নামায বলা হয়। সূর্য্য ভালভাবে উঠার পর রাসুল (সঃ) এ নামায পড়তেন।(আবু দাউদ ১মঃ ১৮৩ পৃষ্ঠা)। রাসুল (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি জামাতের সাথে ফযরের নামায আদায় করে সূর্য্য উদয় হওয়া পর্যন্ত আল্লাহর যেকের আযকারে রত থাকবে অতঃপর ভাল ভাবে সূর্য্য উদয় হলে দু-রাকাত (ইশরাকের) নামায আদায় করবে আল্লাহ তার একটি পরিপূর্ণ হজ্জ ও উমরার ছাওয়ার দান করবেন।(তিরমিযী , আততারগীর হাঃ নং-৪৬৪)।

যোহা বা চাশতের নামায

যোহা শব্দের অর্থ সূর্য্যের উজ্জ্বল। যা সূয্যের স্পষ্ট উজ্জ্বলতা থেকে শুরু হয়। এ নামায প্রথম প্রহরের পর হতে দ্বি-প্রহরের পূর্বেই পড়া হয় বলে এটা কে যোহা বলা হয়। রাসুল (সঃ) বলেছেন মানুষের শরীরের ৩৬০টি জোড় আছে তাই তার কর্তব্য হল প্রত্যেক জোড়ের জন্য একটি করে ছদকা করা। সাহাবীগণ বললেন হে আল্লাহর রাসুল (সঃ) কার শক্তি আছে এ গুলি করা। রাসুল (সঃ) বললেন চাশতের দু-রাকাত নামায তার জন্য যথেষ্ট। (মুসলিম, মেশকাত হাঃ নং-১৩১৫)। চাশতের নামায ১-৪-৬-৮-১২ রাকাত পর্যন্ত পড়া যায়। (বোখারী মুসলিম, মেশকাত হাঃ নং-১.৩০৯)।

ইস্তেস্কা বা পানি চাওয়ার নামায

অনাবৃষ্টি এবং দুর্ভিক্ষের অভিযোগে বিশেষ নিয়মে পানি চাওয়ার নাম ইস্তেসকা। ইস্তেসকার নামায মাঠে পড়তে হয়। (আবু দাউদ, তিরমিযী, মেশকাত হাঃ নং- ১৫০৪)। জুমআর খোৎবার সময়ও পানি চাওয়া যায়। (বোখারী ১মঃ ৪১ পৃষ্ঠা)। ইস্তেস্কার জন্য পুরান কাপড় পরে বিনয় সহকারে জড় সড় হয়ে কাদ কাদ ভাবে মাঠে যেতে হয়। (আবু দাউদ, তিরমিযী মেশকাত হাঃ নং-১৫০৪)। পানি চাওয়ার সময় চাদর উল্টাতে হয়। চাদর ডান দিকের কিনার বাম কাধে এবং বাম দিকের কিনার ডান কাঁধে

রাখতে হয়।(আবু দাউদ, মেশকাত হাঃ নং-১৫০৩)। পানি চাওয়ার সময় হাত মুখ বরাবর উঁচু ও লম্বা করে উল্টা পিঠে চাইতে হয়। (মুসলিম, মেশকাত হাঃ নং-১৪৯৯)। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন-একদিন নবী (সঃ) বৃষ্টির জন্য আমাদের নিয়ে বেরুলেন, এবং তিনি আমাদের বিনা আযানে ও ইকামতে নামায পড়ালেন তার পর তিনি খোৎবা দিলেন। (আহ্মাদ ইবনে মাযা)। রাসুল (সঃ) কখনও নামাযের পূর্বে খুৎবা দিতেন আর কখনও নামাযের পরে খুৎবা দিতেন। দুয়েটা জায়েজ। (নাইলুল আওতাব ৪র্থ ৩ পৃঃ)।

ইস্তেকার দোয়া-

اللهم اسق عبادک وبهیمتک وانشر رحمتک واحی بلدک المیت–

উচ্চারণ ঃ আল্লা-হুম্মাস্কি ‘ইবা-দাকা ওয়া বাহীমাতাকা ওয়ানশুর রাহ্মাতাকা ওয়া আহ্য়ী বালাদাকাল মাইয়্যিত।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ তুমি তোমার বান্দাদেরকে এবং জন্তুদেরকে পানি পান করাও এবং তোমার রহমত ছড়িয়ে দাও আর তোমার মৃত শহরকে (বৃষ্টির দ্বারা) জীবিত করে দাও। (মুয়াত্তা ইমাম মালিক, আবু দাউদ, মিশকাত-১৩২ পৃষ্ঠা)।

اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا نافعا غير ضار عاجلا غير اجل

উচ্চারণ ঃ আল্লা-হুম্মাস্কিনা-গাইছাম্ মুগীছান, মারীআন না-ফি’আন গায়রা যা-ররিন ‘আজিলান গায়রা আ-জিলিন।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে এমন বৃষ্টির পানি পান করাও যা ফরিয়াদ দূরকারী, পিপাসা নিবারণকারী, সাচ্ছন্দ দানকারী ও শস্য উৎপাদনকারী, উপকারী, অপকারী নয়, শীঘ্রই আগমনকারী, বিলম্বকারী নয়। (আবু দাউদ মিশকাত-১৩২ পৃষ্ঠা) ৩৫

৩৫ প্রচলিত হানাফী মাযহাবের আছে ইস্কেকার নামাযে জামাত ও চাদর উল্টনো এবং খোৎবা দেওয়া জায়েজ নেই। (হেদায়া ১ম ১৭৬ পৃষ্ঠা)। সহীহ হাদীসের খেলাফ এটা কখন ও বিশ্ববনী (সঃ) এর ইস্তেস্কার নামাযের পদ্ধতি হতে পারে না। আল্লাহ আমাদের সবাইকে সহীহ হাদীসের উপর আমল করার তৌফিক দিন। আমীন।

চন্দ্র ও সূর্য্য গ্রহণের নামায

রাসুল (সঃ) বলেন, সূর্য্য চন্দ্র আল্লাহর নির্দশন সমূহের মধ্যে দুটি বিশেষ নিদর্শন। কারুর মৃত্যু ও জন্মের কারণে এরা গ্রহণ গ্রস্ত হয় না। চন্দ্র সূর্য গ্রহণের নামায জামাতে পড়ার জন্য ঘোষণা দিতে হবে।(বুখারী, মুসলিম) জামাত ইদ গাহে ও মসজিদে উভয়ই জায়গায় করা যায়। (আহমাদ) রাসূল (সঃ) বলেছেন- যখন তোমারা ঐ গ্রহণ দেখবে তখন তা প্রকাশ হওয়া পর্যন্ত আল্লাহর নিকট দোয়া

প্রার্থনা কর, তাকবীর বল, দান সদকা কর, এবং নামায পড়তে থাক ।(বোখারী, মুসলিম, নাইলুল আওতায় ১মঃ ১৩৪ পৃষ্ঠা) । ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন–রাসুল (সঃ) এর যুগে একদা সূর্য্য গ্রহণ হলে আল্লাহর রাসুল (সঃ) নামায আদায় করেন এবং লোকেরাও তার সাথে নামায আদায় করেন প্রথমে তিনি নামাযে দাঁড়ালেন এবং সূরা বাকারার মত কেরাত পাঠ করলেন, তারপর খুব লম্বা রুকু করলেন তার পর মাথা তুলে কেরাত পাঠ করতে লাগলেন তবে প্রথম কেরাতের চেয়ে একটু কম কেরাত পাঠ করে রুকুতে গেলেন এবারের রুকু প্রথম রুকুর চেয়ে একটু কম হল । তারপর তিনি রুকু হতে মাথা তুলে সেজদা করলেন । সেজদা শেষ করে দাঁড়ালেন অতঃপর লম্বা কেরাত পাঠ করলেন তবে প্রথমের তুলনায় একটু ছোট কেরাত পাঠ করলেন, এরপর তিনি লম্বা রুকু করলেন যা প্রথম রুকুর তুলনায় কম ছিল । রুকু থেকে মাথা তুলে পুনরায় কেরাত পাঠ করলেন, যা প্রথমের তুলনায় একটু ছোট ছিল । অতঃপর খোৎবা দিলেন এই বলে যে সূর্য্য ও চন্দ্র আল্লাহর নির্দশন সমুহের মধ্যে দুটি নিদর্শন; কারুর জুন্ম ও মৃত্যুর কারণে এই গ্রহণ হয় না । যখন তোমরা ঐ গ্রহণ দেখবে তখন আল্লাহর যেকের করবে ।(বোখারী মুসলিম, মেশকাত ৪৮২ পৃষ্ঠা) । ৩৬

৩৬ প্রচলিত হানাফী মাযহাবের ফেকাহর কেতাবে লেখা হয়েছে গ্রহণের নামায সাধারণ নফলের মত রুকু একটা হবে এবং আস্তে পড়তে হবে, খোৎবা নেই ।(দেখুন হেদায়া ১ম খন্ড ১৭৫ পৃঃ) । এটা কোন দিন বিশ্বনবীর গ্রহণের নামাযের পদ্ধতি নয় ।

ইস্তেখারার নামায

ইস্তেখারা অর্থ- কোন বিষয়ের ভাল দিকটা খোঁজ করা । কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজে যাওয়ার আগে তারজন্য ইস্তেখারা করা উচিত । ইস্তেখারার নিয়ম সম্পর্কে হযরত জাবের (রাঃ) বলেন- রাসুল (সঃ) আমাদেরকে বিভিন্ন বিষয় ইস্তেখারা করার শিক্ষা দিতেন । এভাবে দিতেন যে ভাবে তিনি আমাদের কোরআনের সুরা শিক্ষা দিতেন । তিনি (সঃ) বলেন যখন তোমাদের কেউ কোন কাজের ইচ্ছা করবে তখন সে যেন ফরয নামায ছাড়া ২ রাকাত (নফল) নামায পড়ে । তারপর নিম্নের দোয়াটি পড়তে হবে ।

اللهم انى استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك
واسالك من فضلك العظيم فانك تقدر ولا اقدر وتعلم
ولا اعلم انت علام الغيوب- اللهم ان كنت تعلم ان هذا
الامر خير لى فى دينى ومعاشى وعاقبة امرى او قال

عاجل امرى واجله فاقدره لى ويسره لى ثم بارك لى
فيه وان كنت تعلم ان هذا الامر شر لى فى دينى
ومعاشى وعاقبة امرى اوقال فى عاجل امرى واجله
فاصرفه عنى واصرفنى عنه واقدر لى الخير حيث
كان ثم ارضنى به-

উচ্চারণ ঃ আল্লা-হুম্মা ইন্নী আস্‌তাখীরুকা বি'ইলমিকা ওয়া আস্‌তাকদিরুকা বিকুদ্‌রাতিকা ওয়া আস্‌আলুকা মিন ফাযলিকাল 'আযীম; ফা ইন্নাকা তাক্‌দিরু ওয়ালা-আক্‌দিরু ওয়া তা'লামু ওয়ালা আ'লামু ওয়া আন্‌তা 'আল্লা-মুল গুয়ুব । আল্লা-হুম্মা ইন্‌ কুন্‌তা তা'লামু আন্না হা-যাল আম্‌রা ("হা-যাল আম্‌রা" বলার সময় নিজের প্রয়োজনের কথা মনে করবে) খায়রুন লী ফী দ্বীনী ওয়া মা'আ-শী ওয়া 'আ-কিবাতি আমরী আওক্বালা 'আ-জিলি আম্‌রী ওয়া আজিলিহি ফাক্‌দুরহু লী ওয়া ইয়াস্‌সিরহু লী ছুম্মা বা-রিক্‌লী ফীহ, ওয়া ইন্‌ কুন্‌তা তা'লামু আন্না হা-যাল আমরা (এখানেও পুনরায় নিজের প্রয়োজনের কথা মনে করবে) শাররুল লী ফী দীনী ওয়া মা'আ-শী ওয়া 'আ-কিবাতি আম্‌রী ওয়া ফী 'আ-জিলি আম্‌রী ওয়া আ-জিলিহি ফাসরিফ্‌হু 'আন্নী ওয়াস্‌রিফ্‌নী 'আন্‌হু ওয়াকদুর লিয়াল খায়রা হায়ছু কা-না ছুম্মারযিনী বিহ ।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার জ্ঞানের মাধ্যমে তোমার কাছে ভালটা জানতে চাচ্ছি এবং তোমার শক্তির বদৌলতে তোমার কাছে শক্তি কামনা করছি, আর তোমার কাছে তোমারই মহানুগ্রহ প্রার্থনা করছি । কারণ নিশ্চয়ই তুমি শক্তির অধিকারী, কিন্তু আমি মোটেই শক্তি রাখিনা এবং তুমি সবই জান আমি কিছুই জানি না । আর তুমি তো অদৃশ্যেরও জ্ঞানী । (তাই) হে আল্লাহ তুমি যদি জান যে, আমার একাজটা আমার জন্য ভাল হবে আমার দীনী ও দুনিয়াবী জীবনে এবং পরিণামে কিংবা আমার জলদি কাজে ও বিলম্বিত কাজে তাহলে ঐ কাজের শক্তি আমাকে দাও এবং তা আমার জন্য সহজ করে দাও । তারপর সেটাতে আমার জন্য বরকত দান কর ।

'এ জায়গায় ঐ কাজটা উল্লেখ করতে হবে যার জন্য ইস্তেখারা করা হচ্ছে ।' আর যদি তুমি জান যে, এই কাজটা আমার জন্য মন্দ হবে, আমার ধর্ম ও পার্থিব জীবনে এবং শেষ পরিণামে কিংবা জলদি কাজে ও বিলম্বিত কাজে তাহ-লে তাকে আমার থেকে দূরে সরিয়ে দাও, আমাকেও তা থেকে দূরে রাখ । আর

আমাকে ভালর শক্তি দাও,তা যেখানে আছে। তারপর তা দ্বারা আমাকে সন্তুষ্ট করাও। ইস্তেখারার নামায দিনে ও রাত্রে যখন ইচ্ছা পড়া যায়। ইস্তেখারার পর শরীয়ত সম্মত যে কাজের দিকে মন টানে সেটাই করা উচিত ওটাই মঙ্গল। স্বপ্নে কিছু দেখা যাবে এরূপ ধারণা সঠিক নয়।(ফিকহুস্ সুন্নাহ ১মঃ ২২৬ পৃষ্ঠা)।

তাওবার নামায

রাসুল (সঃ) বলেন- কোন লোক যদি গোনাহ্ করে তারপর ফিরে এসে অযু করে নামায আদায় করে এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে তাহলে আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করে দেন। (তিরমিযী, মেশকাত ১১৭ পৃষ্ঠা)। উক্ত দুই রাকাত নামাযে সুরা ফাতেহার সঙ্গে সূরা কাফেরুন ও সুরা ইখলাস পড়া উচিত।(বায়হাকী ,ইবনে হিব্বান)।

সালাতুত্ তাসবীহ

এ সালাতে বেশী তাসবীহ্ পড়া হয় তাই এ সালাতকে সালাতুত্ তাসবীহ্ বলা হয়। একদা নবী (সঃ) তাঁর চাচা আব্বাস (রাঃ)- কে বললেন ঃ হে আব্বাস! হে চাচা! আমি কি আপনাকে উপহার দিব না? আমি কি আপনাকে দান করব না? আমি কি আপনাকে খবর দিব না? আমি কি আপনার সাথে দশটা অভ্যাসের ব্যবহার করবনা যা আপনি করলে আল্লাহ্ তা'আলা আপনার প্রথম ও শেষের এবং পুরানো ও নতুন, ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত, ছোট ও বড়, গোপন ও প্রকাশ্য গোনাহ্ মাফ করে দিবেন? তাহলে আপনি চার রাকআত নামায পড়ুন, প্রত্যেক রাক'আতে সূরা ফাতিহা ও একটি সুরা পড়ুন। অতঃপর প্রথম রাক'আতের কির'আত পড়া যখন শেষ করবেন তখন দাঁড়ানো অবস্থায় বলবেন ঃ

سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر

উচ্চারণ ঃ সুবহা-নাল্লা-হি ওয়াল্ হামদু লিল্লা-হি ওয়া লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াল্লা-হু আক্‌বার। এটা ১৫ বার।

তারপর রুকুতে যান এবং রুকু অবস্থায় ঐ তাসবীহটি ১০ বার পড়ুন। তারপর রুকু থেকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে ঐ তাসবীহ ১০ বার পড়ুন। তারপর সিজদায় গিয়ে সিজদা অবস্থায় ১০ বার পড়ুন। সিজদা থেকে মাথা তুলে ১০ বার পড়ুন। তারপর দ্বিতীয় সিজদা করুন এবং সিজদার মধ্যে ১০ বার পড়ুন। তারপর সিজদা থেকে মাথা তুলে বসে বসে আবার ১০ বার তাসবীহ পড়ুন। এই হলো প্রত্যেক রাক'আতে ৭৫ বার তাসবীহ।

এরূপ আপনি চার রাক'আতে করুন। যদি আপনি পারেন তাহলে প্রত্যেক

দিনে এই সালাত একবার পড়ুন। যদি তা না পারেন তাহলে প্রতি জুমু'আয় (সপ্তাহ) একবার পড়ুন। যদি তা না পারেন তাহলে প্রতি মাসে একবার পড়ুন। যদি তা না পারেন তাহলে প্রতি বৎসরের অন্তত একবার পড়ুন। যদি তাও না পারেন তাহলে আপনার জীবনে একবার পড়ুন। (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, বায়হাকী, মিশকাত-১১৭ পৃষ্ঠা) । এ হাদীসটি আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, মুসনাদ আহ্মাদ, হাকিম প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থে এসেছে, যাকে যুগ শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দীস আল্লামা মুহাম্মদ নাসিরুদ্দীন আল্‌বানী সহীহ্ বলেছেন। (মিশকাত তাখরিজ শেখ আলবানীর) (রঃ)।এ নামায রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ও সাহাবীদের থেকে জামা'আত সহকারে পড়ার কোন প্রমাণ নেই, তাই একাকী পড়া ভাল। অনুরূপ বিশেষ কোন সময়ে পড়ার প্রমাণ নেই, তাই বিশেষ কোন সময়ের সাথে নির্দিষ্ট করাটাও বিদ'আত মুক্ত নয়। (সহীহ ফিকহুস সুন্নাহ-১ম খন্ড ৪২৮ পৃষ্ঠা) ।

জানাজার নামায

জানাজা ইসলাম বিশ্ব জগতের মানব জাতিকে এক ধর্মনীতি ও আদর্শ শিক্ষা দিয়েছেন। যার নজির পৃথিবীর ভিতরে অন্য কোন জাতির মধ্যে নেই। জানাজা নামায ফরযে কেফায়া। রাসুল (সঃ) বলেছেন যে ব্যক্তি ইমাণের সাথে নেকির কামনায় জানাজার নামায পড়ে অতঃপর তার দাফনে শরীক হয় সে যেন দু'কেরাত নেকি নিয়ে প্রত্যাবর্তন করে। প্রতি কিরাত অহুদ পাহাড়ের সমান। আর যে ব্যক্তি শুধু জানাজা পড়ে দাফনের আগে চলে আসে তারজন্য এক কিরাত নেকি। (বোখারী, মুসলিম, মেশকাত ১৪৪ পৃষ্ঠা)। রাসুল (সঃ) এর যুগে যখন মৃত্যুব্যক্তির গোসল ও কাফন কার্য্য সমাধা করে রাসুল (সঃ) এর সামনে আনা হত, তখন তিনি তার ঋণ পরিশোধ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতেন।(বোখারী যাদুল মায়াদ ১ম খঃ ৫০৪ পৃষ্ঠা)। পরিশোধ করা হলে তিনি মহিলা লাশের মাঝ বরাবর। (বোখারী, মুসলিম ১৪০ পৃষ্ঠা)। পুরুষলাশের মাথা বরাবর দাঁড়াতেন। (আবু দাউদ, তিরমিযী, যাদুল মায়াদ ১ম ঃ ৫২২ পৃষ্ঠা)। কিন্তু প্রচলিত হানাফী মাযহাবে এর ব্যতিক্রম দেখা যায়। জানযায় মেয়ে-পুরুষের মাঝ বরাবর দাড়ানো হয় এটা বিশ্ব নবী (সাঃ) এর যানাজা নামাযে দাঁড়ানোর পদ্ধতি নয়। জানাযার তাকবির ৪টি দিতে হয়। সানা পড়া সম্পর্কে কোন নির্ভর যোগ্য প্রমান পাওয়া যায় না। রাসুল (সঃ) জানাজায় প্রথম তাকবীরে সুরা ফাতেহা পড়তেন।((আবু দাউদ তিরমিযী, মেশকাত ১৪৬ পৃষ্ঠা)। রাসুল (সঃ) এর চাচাত ভাই আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস বলেন- জানাজায় সূরা ফাতেহা পড়া সুন্নাত। (বোখারী মেশকাত ১৪৫ পৃষ্ঠা)। এবং অন্য একটি সুরা পড়া

ও সুন্নাত। (নাসাঈ, ১মঃ ১৮১ পৃষ্ঠা। বায়হাকী ৪র্থ ঃ ৩৮ পৃষ্ঠা)। এবং এটা মানুষ কে জানানর জন্য তিনি (সঃ) উচ্চ স্বরে পড়তেন।

(বোখারী আবু দাউদ, মেশকাত ১৪৫ পৃষ্ঠা)। ৩৭

৩৭ প্রচলিত হানাফী মাযহাবে মানুষের জীবনের শেষ নামায জানাজায় সুরা ফাতেহা পড়া হয় না। এটা সহীহ হাদীসের খেলাফ।(দেখুন কেতাবুল উম্ম। ১মঃ ২৩৯ পৃষ্ঠা)। হানাফী মাযহাবের বরেণ্য ফেকাহর কেতাবেও জানা জায় সুরা ফাতেহা পড়ার কথা এসেছে। (দেখুন- মালা বুদ্দা মিনহু ৮২ পৃষ্ঠা)। এছাড়াও হানাফী মযহাবের বিখ্যাত বিখ্যাত দেওবন্দি উলামা ও মুফতীগণ তারা তাদের নিজ নিজ গ্রন্থে জানাজায় সুরা ফাতেহা পড়ার কথা তুলে ধরেছেন। যেমন-- আলামা আইনী, শাহ ওলিউল্লাহ, আব্দুল হাই লাখনবী, মোল্লা আলী কারী সহ আরও অনেক হানাফী বিদ্যান।

অতএব, প্রচলিত মাযহাবে যে জানাজায় সুরা ফাতেহা পড়া হয় না এটা কখনও বিশ্বনবী (সঃ) এর জানাজা নামাযের পদ্ধতি নয়। বিশ্বনবী (সঃ) এর জানাজার পদ্ধতি হচ্ছে ইমাম মুক্তাদী উভয়ই জানাজায় সুরা ফাতেহা পড়া। আল্লাহ সবাইকে বিশ্বনবী (সঃ) এর সহীহ হাদীস অনুযায়ী জীবনের শেষ প্রাপ্য জানাজটি সম্পাদন করাব তৌফিক দিন আমীন।

অতঃপর দ্বিতীয় তাকবীর দিয়ে নামাযে যে দুরুহ পাড়া হয় অর্থাৎ দুরুদে ইবরাহীম তা পড়তে হবে।(বায়হাকী যাদুন মায়াদ ১মঃ ৫০৫ পৃঃ)। তারপর তৃতীয় তাকবীর দিয়ে নিম্নোক্ত দোয়াটি পড়বে। সর্ব শেষে ৪র্থ তাকবীর দিয়ে প্রথমে ডাইনে পরে বামে সালাম ফিরাবে। (যাদুল মায়াদ ১মঃ ৪৯২ পৃষ্ঠা)। একদিকে সালাম ফিরান জায়েজ আছে। (দারা কুতনী হাকেম)- হাদীস সহীহ। প্রতি তাকবীরে রউফল ইয়াদাহইন করলে তা করে হাত সিনার উপর বাঁধতে হবে। জানাজা নামাযে কয়েকটি দোয়ার কথা হাদীসে এসেছে তার মধ্যে এই দোয়াটি খুব সুপরিচিত।

اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا انثانا اللهم من احييته منا فاحيه على الايمن ومن توفيته منا فتوفه على الاسلام اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده

উচ্চারণ ঃ আল্লা-হুম্মাগ ফিরলী হাইয়্যিনা-ওয়া মায়্যিতিনা-ওয়া শা-দিহিনা-ওয়া গা-য়িবিনা-ওয়াসাগীরিনা-ওয়াকাবীরিনা-ওয়াযাকারিনা-ওয়া উনছা-না। আল্লা হুম্মা মান আহ্ইয়াইতাহু মিন্না-ফাআহ্য়িহী আলাল ইসলা-ম। ওয়ামান তাওয়াফ্ ফাইতাহু মিন্না-ফাতাওয়াফ্ ফাহু 'আলাল ঈমা-ন আল্লা-হুম্মা লা-তাহ্‌রিমনা-আজ্‌রাহু ওয়ালা-তাফতিন্না-বা'আদাহ।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমাদের জীবিত ও মৃত এবং (এই জানাযায়) উপস্থিত ও

অনুপস্থিত, আর আমাদের ছোট ও বড় এবং আমাদের নর ও নারী সবাইকে ক্ষমা কর। হে আল্লাহ! আমাদের মধ্য থেকে তুমি যাকে বাঁচিয়ে রাখবে তাকে তুমি ইসলামের উপরে বাঁচিয়ে রাখো এবং যাকে তুমি মারতে চাও তাকে তুমি ঈমানের অবস্থায় মেরে নাও। আর হে আল্লাহ এই লাশের প্রতিদান থেকে তুমি আমাদের বঞ্চিত করো না এবং এর পরে আমাদেরকে ফেতনায় ফেলো না।

মাইয়্যেত শিশু হলে পড়তে হবে,

اللهم اجعله لنا سلفا و فرطا ذخرا واجرا

হে আল্লাহ আপনি এই শিশুকে আমাদের জন্য পূর্বগামী অগ্রগামী এবং আখেরাতের পুঁজি ও পুরস্কার হিসাবে গণ্য করুন। আর মেয়ে হলে وجعلها পড়বে। (বোখারী মেশকাত হাঃ নং-১৬৯০)। শিশুদের জন্য বাড়তি এগুলি না পড়লেও দোয়াটির মধ্যে সবার জন্য ইশারা ইঙ্গিত রয়েছে।

রাসুল (সঃ) কে ৩ খানা সাদা ইয়ামানী সূতি কাপড়ে কাফন পরান হয়। যার ভিতরে জামা ও পাগড়ী ছিল না। (বোখারী মুসলিম হাঃ নং ৯৪১)। ৫ কাপড়ের হাদীসটি সম্পর্কে অনেকে আপত্তি তুলেছেন। (ফিকহেস সুন্নাহ ১ম ৬৩৩ পৃঃ)।

নারীদের জন্য পৃথক নিয়মের ব্যাপারে ও অনেকে আপত্তি তুলেছেন। স্বামী স্ত্রীকে ও স্ত্রী স্বামীকে গোসল দিতে পারে। (আবু দাউদ ইবনে মাযা, নাইলুন আওতার ৪র্থ ঃ ২৭ পৃষ্ঠা)। এবং সেটাই উত্তম। হানাফী ফিকাহ দুররে মুক্তারের ভিতরে ও দেখুন লেখা হয়েছে স্বামী স্ত্রীকে ও স্ত্রী স্বামীকে গোসল দিতে পারে। (দেখুন দুররে ৩০৩ পৃঃ ও ৪০৩ প্রৃঃ ও বেহেশতের জেওয়ার ৮৮ প্রৃঃ)। ৩৮

কিন্তু বর্তমান প্রচলিত হানাফী মাযহাবের নিয়ম হচ্ছে মহিলা পুরুষের ও পুরুষ মহিলাদের গোসল দিতে পারবে না। যামাত করতেও পারবে না পুরুষের নামাযেও শরীক হতে পারবে না এবং জানাযা গাইবানা পড়া যাবে না এবং জানাযা মসজিদে ও পড়া যাবে না।এ পদ্ধতি বিশ্বনবী (সঃ) এর নিয়মে নয়। মহিলারা জামাত করে অথবা পর্দার সাথে পুরুষদের জামাতে শরীক হতে পারবে। (আল মুগনী, ফিকহেস সুন্নাহ ১মঃ ৬৪২ পৃঃ)। গায়েবানা জানাজা পড়া যায়। (বোখারী, মুসলিম, মেশকাত ১৪৪ পৃষ্ঠা)। জানাজা মসজিদে পড়া যায়। (মুসলিম যাদুল মোযাদ ১মঃ ৫০০ পৃঃ)।

তাহাজ্জদ বা তারাবী নামাযের বিবরণ

তারাবীও তাহাজ্জদ মুলতঃ রাতের নামায। রাতের নামায নফল হলেও গুরুত্ব অনেক বেশি। যেমন আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত রাসুল (সঃ) বলেছেন

افضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل

অর্থাৎ ঃ- ফরয নামাযের পরে সর্বোত্তম নামায হচ্ছে রাতের নামায। (মুসলিম মেশকাত হাঃ নং-২০৩৯)। রাতের নামায (তাহাজ্জদ) শেষে বেতের পড়তে হয়। (বোখারী মুসলিম, মেশখাত হাঃ নং-১২৪৮)। রাতের নামাযের উত্তম সময় হচ্ছে রাত্র ৩ ভাগের ২ ভাগ অতিবাহিত হওয়ার পর থেকে ফজরের পূর্ব পর্যন্ত। কারণ ঐ সময় আল্লাহ নিকটতম আসমানে অবতরণ করেন শেষ পর্যন্ত। (বোখারী মুসলিম, মেশকাত ১০৬ পৃষ্ঠা)। রাতের নামায পড়লে নিয়মিত পড়া উচিত কেননা আল্লাহর নিকট অধিক পছন্দনীয় আমল হচ্ছে স্থায়ী আমল যদিও তা কম হয়। হযরত আয়শা বলেন অসুস্থ অথবা অন্য কোন কারণে রাসুল রাতের নামায তাহাজুদ ছুটে গেলে দিনে ১১ রাকাতের পরিবর্তে ১২ রাকাত পড়তেন। (মুসলিম হাঃ নং-৭৫৫)। দিনে দুপুর হওয়ার পূর্বে। (ফিকহেস সুন্নাহ ১মঃ ৪১৬ পৃষ্ঠা)। হযরত আয়শা বলেন- রাসুল (সঃ) রমজানে হোক অথবা অন্য কোন মাসে হোক এ নামায বেতের সহ ১১ রাকাতের বেশি পড়তেন না। (বোখারী মুসলিম, যাদুল মায়াদ ১ম ৩২৫ পৃষ্ঠা)। এটাই উত্তম। তবে বেতের সহ ৯ ও ৭ রাকাত পড়াও যায়।(তিরমিযী)। রমজানে এ নামাযের কেরাত খুব দীর্ঘ হত। (বোখারী)। তাই এ নামাযে রাসুল (সঃ) ৪ রাকাত পর পর একটু বিশ্রাম নিতেন। (বোখারী)। এ বিশ্রামকে আরবীতে তারবিহা বলা হয়। তারবিহার বহু বচন তারাবী। তাই উলামাগণ রমজান মাসের এ নামাযকে তারাবী বলেছেন। রাসুল (সঃ) রমজানে মসজিদে নব্বীতে যে ৩ দিন (২৩, ২৫, ২৭) জামাত সহকারে নামায পড়ে ছিলেন সে তিন দিনের প্রথম রাতের এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত। ২য় দিন মধ্যরাত পর্যন্ত। ৩য় দিন স্ত্রী কন্যাসহ সাহারীর পূর্ব পর্যন্ত দীর্ঘ নামায আদায় করেন। (আবু দাউদ, তিরমিযী, মেশকাত হাঃ নং ১২৯৮)। তবে প্রথম রাত্রে জামাত সহকারে মসজিদে তারাবী পড়া, শেষ রাত্রে একাকী ঘরে তাহাজুদ পড়ার চেয়ে উত্তম। (বোখারী মেশকাত হাঃ নং-১৩০১)। রমজানে প্রথম রাত্রে তারাবী পড়লে শেষ রাত্রে তাহাজ্জদ পড়া লাগে না। সহীহ ইবনে হিব্বাস ও সহীহ ইবনে মুযায়মা তাদের স্ব স্ব গ্রন্থে হযরত যাবের (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে রাসুল (সঃ) আমাদের নিয়ে যে তিন দিন জামাত সহকারে তারাবী পড়িয়ে ছিলেন তার রাকাতের সংখ্যা ছিল বেতের সহ ১১। এদিকে মা আয়শা (রা) এর সাক্ষ্য রয়েছে। যে রমজানে রাসুল (সঃ) কে বেতের সহ ১১ রাকাতের বেশি পড়তে আমি কখনও দেখেনি। এই সহীহ হাদীস খানা বোখারী মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী নাসাঈ, ইবনে মাযা সহীহ ইবনে খুযায়মা মুসনাদে আহমাদ,

মুসনাদে আবু আওয়ানা, মুয়াত্তা মুহাম্মাদ, রায়হাকী তাহাবী, শরহে স সুন্নাহ মুয়াত্তা মালেক, দারেমী প্রমুখ তাদের স্ব স্ব গ্রন্থে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ৩৯

৩৯ প্রচলিত হানাফী মাযহাবে তারাবী ২০ রাকাত পড়ার প্রচলন আছে এর কোন প্রমান রসুলের (সঃ) এর সহীহ হাদীসে পাওয়া যায় না। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে একটি মাত্র হাদীস তার স্বপক্ষে পাওয়া যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় হাদীস খানা দুজন মিথ্যাবাদী দ্বারা বর্ণিত। একজন ইবরাহীম বিনওসমান আবু শায়বা। অপরজন হাকাম বিন ওতায়বা বিন নুহাস কুফি। ২০ রাকাতের সপক্ষে কয়েকটি আসার রয়েছে তা একটি ও সহীহ নয়। তারাবী নামায বিশ রাকআত যে সঠিক নয় এবং আট রাকআতই যে সঠিক একথা শিকার করে হানাফী মাযহাবের অন্যতম পন্ডিত যিনি ভারতের বোখারী নামে ভূষিত সেই আল্লামা আনোয়ার শাহ্ কাশমিরী (রহঃ) বলেন- রাসুল (সঃ) থেকে ৮ রাকাত তারাবী সহীহ সনদে প্রমাণিত, আর ২০ রাকাত রাসুল (সঃ) থেকে যঈফ হাদীসে এসেছে এবং হাদীসটি যঈফ হওয়াতে সকলেই একমত। (দেখুন উরফুস শাজী ৩২৯ পৃষ্ঠা)। তিনি ঐ কেতাবে আরও লিখেছেন এ কথা শিকার করা ছাড়া কোন উপায় নেই যে রাসুল (সঃ) এর তারাবী ছিল ৮ রাকাত। এ কথার প্রতিবাদ করার মত হিম্মত কোন নামধারী মুফতীদের আজ পর্যন্ত হল না। অতএব ২০ রাকাত তারাবী এটা কখনও বিশ্বনবী (সঃ) এর তারাবী নয়, বিশ্বনবী (সঃ) এর তারাবী হচ্ছে ৮ রাকাত। সহীহ হাদীসের উপর আমল করার সব ভাইকে আল্লাহ তৌফিক দিন আমীন।

তারাবীর বিশেষ কোন দোয়া নেই। তারাবীর দোয়া বলে প্রচলিত মাযহাবী নামায শিক্ষায় যা পাওয়া যায় তা মন গড়া। তারাবী ও তাহাজ্জদ দুটো একই নামায় যার রাকাতের সংখ্যা সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত বেতের সহ ১১। এবং ২০ রাকাতের হাদীস প্রমাণিত নয়। সেটা হানাফী মাযহাবের বরেণ্য ফেকাহ ও তাদের বরেণ্য উলামায়ে কেরামদের সাক্ষ্যসহ বিস্তারিত দেখুন আমার লেখা তারাবী ২০ রাকাত নামক লেখনীর জবাব।

ঈদের নামাযের বিবরণ

২য় হিযরির ১লা শাওয়াল রাসুল (সঃ) সর্ব প্রথম ঈদুল ফেতেরের নামায আদায় করেন। এর পর থেকে তার জীবনে কোন দিন ঈদুল ফেতের ও ঈদুল আযহার নামায বাদ দেননি। এমন কি ওযর আপত্তি অগ্রহ্য করে মহিল-াদেরকেও ঈদের নামায পড়ার জন্য কঠোর ভাবে নির্দেশ দিয়েছেন। (আবুদাউদ) তাই ঈদের নামায ওয়াযিব কোন মতে পরিত্যাজ্য নয়। (মেরআত ২য় খন্ড ৩২৭ পৃষ্ঠা)। রাসুল (সঃ) দুই ঈদে গোসল করতেন।(ইবনে মাযাহ ৯৪ পৃষ্ঠা)। এবং ভাল কাপড় পরতেন।(যাদুল মায়াদ ১ম ৪৪১ পৃষ্ঠা)। এবং কিছু খেয়ে ঈদুল ফেতরে সকাল সকাল ঘর থেকে বের হতেন। (বোখারী হাঃ নং-৯৫৩)। এবং ঈদুল আযহার দিনে কিছু খেতেন না নামাযের পর কোরবানীর গোস্ত খেতেন। (তিরমিযী আহমাদ, নাইলুল আওতার ৩য় খন্ড ২৮৮ পৃষ্ঠা)। তিনি বৃষ্টির কারণে একবার মসজিদে ঈদের নামায পড়ে ছিলেন। আর সব সময় ঈদের নামায ঈদগাহে পড়তেন।(যাদুল মায়াদ ১মঃ ৪৪১' পৃষ্ঠা)। ঈদের নামায আযান ইকামাত ছাড়া পড়তেন। (মুসলিম, তিরমিযী , আবু

দাউদ, নাইলুল আওতার ৩য় খঃ ২৮৮ পৃষ্ঠা।) । তিনি (সঃ) ১টি খোৎবা দিতেন।(বোখারী)। ইমাম নব্বী (রহঃ) বলেন একাধিক খোৎবার কোন প্রমাণ নেই। (ফেকহুস সুন্নাহ ১ম ৪১৪ পৃষ্ঠা)। খোৎবার পূর্বে দুরাকাত নামায পড়তেন। তিনি (সঃ) প্রথম রাকাতে কেরাতের পূর্বে ৭ তাকবীর এবং ২য় রাকাতে কেরাতের পূর্বে ৫ তাকবীর অতিরিক্ত দিতেন। (তিরমিযী, আবু দাউদ মেশকাত ১২৬ পৃষ্ঠা)। মোট ১২ তাকবীর দিতেন। ১২ তাকবীরের স্বপক্ষে তিরমিযীতে ৫টি। আবু দাউদে ১টি। ইবনে মাযায় ১টি। মুয়াত্তা ইমাম মালেক ২টি। মুসনাদে বাজ্জার, মুসন্নাদে ইবনে আব্দুর রাজ্জাক, দারাকুতনী, তাবারানী এবং তহাবী ও মুয়াত্তা মুহাম্মাদ প্রভৃতি ১১টি হাদীস গ্রন্থে ২২টির ও অধিক হাদীসে সাক্ষ্যদেয় যে রাসুল ১২ তাকবীরে ঈদ পড়েছেন। আর এটাই হচ্ছে সুন্নাত। হানাফী ফেকাহের মধ্যে লেখা হয়েছে ১২ তাকবীরে ঈদের নামায পড়ার হাদীস সহীহ। (ফেকাহ শরাহ বেকায়া ১৫১ পৃঃ)। মক্কা মদিনায়ও ১২ তাকবীরে এ নামায পড়া হয়। ৪০

৪০ প্রচলিত হানাফী মাযহারে ঈদের নামায ৬ তাকবীরে পড়া হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, রাসুল (সঃ) ৬ তাকবীরে ঈদের নামায আদায় করেছেন এই মর্মে কোন সহীহ, যঈফ, মারফু হাদীস নেই। জানাজা নামাযের মত ৪ তাকবীর। (আবু দাউদ, মেশকাত হাঃ নং-১৪৪৩)। এর সনদ যঈফ এবং ৯ তাকবীর মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়রা (বোম্বাই ১৯৭৯) ২য় খঃ ১৭৩ পৃষ্ঠায় যে হাদীসটি এসেছে সেটাও মূলতঃ ইবনে মাসউদের উক্তি তিনি এটিকে রাসুলের দিকে সম্পৃক্ত করেননি। তারপরও উক্ত বর্ণনাটি সকলেই যঈফ বলেছেন।(দেখুন রায়হাকী ৩য় ২৯০ পৃষ্ঠা। মিরআত ২য় খঃ ৩৪৩ পৃষ্ঠা)। ইমাম বায়হাকী বলেন– এটি ইবনে মাসউদের ব্যক্তিগত রায়মাত্র এই দুটি দলিল ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অনেকে আবার কয়েকটি দলিল আবিষ্কার করেছেন যা সবই বানাওয়াট। ইমাম বাইহাকী বলেন, রাসুল (সঃ) থেকে বর্ণিত মারফু হাদীস যার উপর মুসলিমদের আমল চালু আছে (১২ তাকবীর) তার উপর আমল করাই উত্তম। (দেখুন বায়হাকী ২য় খঃ ২৯০ পৃষ্ঠা)। চার খলিফাসহ প্রায় সকল সাহাবী, তাবেয়ী ও স্রেষ্ট ইমামগণ ১২ তাকবীরে ঈদের নামায পড়ছেন।(দেখুন-বায়হাকী ৩য় ঃ ২৯১ পৃষ্ঠা।) ইমাম বোখারী (রা) বলেন–১২ তাকবীরের অধিক সহীহ কোন হাদীস হাদীসের পাতায় নেই।(দেখুন-তিরমিযী ১মঃ ৭০ পৃষ্ঠা)। অতএব রাসুল (সঃ) থেকে কোন সহীহ মারফু হাদীসে ৬ তাকবীরে ঈদ পড়ার কথা প্রমান না থাকায় ওটা কখনও বিশ্বনবী (সঃ) এর ঈদের নামাযের পদ্ধতি হতে পারে না। আল্লাহ সবাইকে বিশ্ব নবী (সঃ) এর পদ্ধতি তথা সহীহ হাদীসের উপর আমল করার তৌফিক দিন। আমীন। – عبد الستار

লেখকের প্রকাশিত বই

★ সহীহ হাদীসের আলোকে **রাসুল (সঃ)-এর নামায**।

★ তারাবী নামায **২০** রাকাত নামক লেখনির **জবাব** ও সহীহ হাদীসের আলোকে তারাবী নামায **৮ রাকাত**।

★ ইমামের পিছনে সূরা ফাতেহা পড়া প্রসঙ্গে মাওলানা ওয়াক্কাস আলী সাহেবের (রেজালের উদ্বৃতি দিয়ে) দেওয়া **জবাব** এর **জবাব**।

★ রুকু পেলে রাকাত হবে নামক লেখনির **জবাব** ও রুকু পেলে রাকাত-হবে না প্রমাণস্বরূপ **২৯ টি দলীল**।

★ ইমামের কিরাআতই মুক্তাদীর জন্য কেরাত নামক লেখনির **জবাব** ও ইমামের পিছনে সূরা ফাতেহা পড়ার দলীল আকাশের নক্ষত্রের মত উজ্জল, প্রমাণস্বরূপ **২১২টি দলীল**।

★ বিশ্বনবী (সঃ)-এর নামাযই হানাফী মাযহাবের নামায নামক বই এর **জবাব** ও সহীহ হাদীসের আলোকে **বিশ্বনবীর নামায (সঃ)**।

★ জুম'আর দিন মসজিদে আযান **দু'টি হবে না একটি ?**
(ওসমানী আযান ও তার কারণসমূহ)

★ নামাযে শুধুমাত্র তাক্বীরে তাহরীমার সময় রফউল ইয়াদাইন করিতে হইবে-নামক দলীলের **জবাব** ও রফউল ইয়াদাইন রাসূল-(সঃ)-এর জীবন্ত সুন্নাত প্রমাণস্বরূপ **৮০টি দলীল**।

★ নামাযে হাত নাভির নীচে বাঁধতে হবে নাম দলীলের জবাব ও নামাযে হাত বুকের উপর বাঁধা সুন্নাত। **প্রমাণস্বরূপ ১৮টি দলীল**।

★ নামাযে 'আমীন' নীরবে বলতে হবে নামক দলীলের জবাব ও নামাযে 'আমীন' উচ্চৈঃস্বরে বলতে হবে। **প্রমাণসরূপ ৩৯টি দলীল**।

ইনশাআল্লাহ প্রকাশের পথে

★ (আহ্‌লে হাদীস কর্তৃক) ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর উপর মিথ্যা ভিত্তিহীন অভিযোগের জবাব নামক লেখনির **সমুচিত জবাব**।

★ মুসাফাহ্ দুই হাতে না চার হাতে।

★ তৌহীদের মর্মকথা।

★ সহীহ হাদীসের আলোকে সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা সহ কোরআন মাজীদের অনুবাদ।

লেখকের পূর্ণ ঠিকানা

মাওলানা আবদুস সাত্তার কালাবগী

গ্রাম ও পোষ্ট ঃ কালাবগী, থানা ঃ দাকোপ

জেলা ঃ খুলনা, মোবাইল ঃ ০১৭২০-৪৭৯৮৭৬, ০১৯৩৮-০২৩২০৬